Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

৭ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুলাই ২০০৪

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

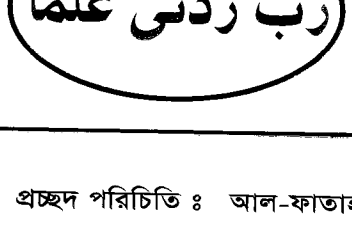

مجلة "التحريك" الشهرية علمية وأدبية و دينية
جلد:٧ عدد: ١٠، جمادى الأولى و جمادى الثانية ١٤٢٥هـ/يوليو ٢٠٠٤م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ আল-ফাতাহ গ্রান্ড মসজিদ, বাহরাইন।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on real Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned scholars and Columnists of home and abroad, aiming to establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health, Medicine & Agriculture 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 & Tk. 90/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৭ম বর্ষঃ	১০ম সংখ্যা
জুমাঃ উলা-জুমাঃ ছানিয়া	১৪২৫ হিঃ
আষাঢ়-শ্রাবণ	১৪১১ বাং
জুলাই	২০০৪ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ **tahreek@librabd.net**
ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআনঃ
  - ক্বিয়ামতের কিছু আলামত? ০৩
- দরসে হাদীছঃ
  - নিঃস্ব কে? ০৮
- প্রবন্ধঃ
  - পর্দাহীনতার বিষময় ফল ও আধুনিকতা ১০
    - ড. আ,ক,ম, আবদুল কাদের
  - ভারতের চানক্য নীতি ও আজকের বাংলাদেশ ১৪
    -ডাঃ ফারূক বিন আবদুল্লাহ
  - ভিন্ন চোখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০
    -শেখ মাফিজুল ইসলাম
- সাময়িক প্রসঙ্গঃ ২২
  - ফাযিল-কামিলের মান প্রদানে ঢাকায় স্বতন্ত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চাই
    - মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান
- ছাহাবা চরিতঃ ২৪
  - বিলাল বিন রাবাহ (রাঃ) (শেষ কিস্তি)
    - মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
- দিশারীঃ ২৭
  - কতিপয় ভ্রান্ত লেখনীর জবাব
    - মুযাফ্ফর বিন মুহসিন
- কবিতাঃ ৩১
  (১) এই বর্ষায় (২) প্রতিবাদ (৩) মেকি ইসলাম (৪) ঋতুচক্র
- ক্ষেত-খামারঃ ৩২
  * সবুজ সার ধঞ্চে * ধনেপাতা গ্রাম
  * দুই সহোদরের ঔষধি বাগান
- মহিলাদের পাতাঃ ৩৩
  - সন্তান প্রতিপালনঃ শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি
    - শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন
- সোনামণিদের পাতাঃ ৩৬
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৭
- মুসলিম জাহান ৪১
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪২
- সংগঠন সংবাদ ৪৩
- পাঠকের মতামত ৪৬
- প্রশ্নোত্তর ৪৭

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

৭ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা জুলাই ২০০৪

সম্পাদকীয়

জাতীয় বাজেট ২০০৪-২০০৫ঃ

জাতীয় সংসদে ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের জন্য ৫৭,২৪৮ কোটি টাকার এযাবতকালের সেরা উচ্চাভিলাষী বাজেট পাশ হয়েছে। সাধারণভাবে সকল সরকারই জনগণের কল্যাণ চান ও সে লক্ষ্যেই তারা প্রতি বছর বাজেট তৈরী করেন। সে হিসাবে সরকারের প্রদত্ত বাজেটকে আমরা সাধারণভাবে স্বাগত জানাই। সরকারের আশা-আকাংখা অনুযায়ী জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন হৌক, তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত হৌক, দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত দেশের প্রায় সিকি অংশ ছিন্নমূল, বাস্তুহীন, ভূমিহীন, সহায়-সম্বলহীন, অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফুটে উঠুক- আমরা সর্বান্তঃকরণে সেই কামনা করি। কিন্তু কবি বলেন, 'তারজুন নাজাতা, ওয়া লাম তাসলুক মাসালেকাহা, ইন্নাস সাফীনাতা লা তাজরী 'আলাল ইয়াবিসি'। অর্থঃ 'মুক্তির তুমি কামনা কর, অথচ মুক্তির পথে চলো না; নিশ্চয়ই জেনো শুকনার উপরে নৌকা কভু ভাসে না'।

দলীয় রাজনীতির চির অন্ধকার নিয়ম অনুযায়ী সরকারী দল বাজেটের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। এমনকি তাদের কিছু অঙ্গ সংগঠন জাতীয় সংসদে বাজেট পেশ করার আগের দিনই বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে ও তার প্রশংসাগীতি করে রাজধানীতে মিছিল করেছে। অন্যদিকে বিরোধী দল একে 'গরীব মারার বাজেট' বলেছে। এমনকি বিরোধী দলীয় সাবেক অর্থমন্ত্রী একে 'প্রতারণার বাজেট' বলেছেন। বাজেট অধিবেশনের মত বছরের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে এম,পি-গণ বাজেটের প্রসঙ্গের চাইতে পরস্পরের চরিত্র হনন করেছেন বেশী ও বক্তৃতার শেষ দিকে যেন খানিকটা মুখরক্ষার তাকীদে নিজ এলাকার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন দাবী উত্থাপন করেছেন। যেগুলো এ অধিবেশনে বলার বিষয় নয়। অন্যদিকে জাতীয় সংসদের বাইরে যে সকল অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ এবং অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক সংগঠন সমূহ রয়েছে, তাদের প্রায় সবই দলীয় দোষে দুষ্ট। ফলে বাজেটের নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন তাদের কাছ থেকে কদাচিৎ পাওয়া সম্ভব। তবুও তাদের বিভিন্ন মন্তব্য থেকে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য যা বেরিয়ে এসেছে, সেগুলোকে সামনে রেখে এবং সর্বোপরি জনগণের স্থায়ী কল্যাণের কথা বিবেচনায় রেখে আমরা এবারের জাতীয় বাজেট সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করব।

১ম কথা হ'লঃ এটি জাতীয় উন্নয়নের বাজেট নয়, বরং এটি হ'ল মূলতঃ একটি অর্থ বাজেট। যার মূল লক্ষ্য হ'ল ভৌত কাঠামোগত উন্নতি ও তৎসংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। কিন্তু বাস্তবে দারিদ্র্য বিমোচন সর্বদা স্বপ্নই থেকে যায়। ১৯৭১ সাল থেকে এ পর্যন্ত দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যার বার্ষিক তুলনামূলক শতকরা হার যদি সরকার তুলে ধরতে পারতেন, তাহ'লে আমরা বুঝতে পারতাম, আসলেই এসব বিশাল অংকের বাজেট দিয়ে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও হত দরিদ্র লোকদের সংখ্যা দিন দিন কমছে, না বাড়ছে।

দ্বিতীয়তঃ গত বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর ৫০% ব্যয় হ'তে পারেনি। ফলে সামগ্রিক বাজেট কাট ছাঁট করে পুনরায় কমানো হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, বিশাল বাজেট বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় মেকানিজম সরকারের নেই। এবারের বাজেটের অবস্থাও যে সেটা হবে না, তা কে বলবে।

তৃতীয়তঃ বর্তমান বাজেটে শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ সর্বোচ্চ ১২% হ'লেও শিক্ষকদের জন্য পৃথক ও নতুন পে-স্কেল দেওয়া হয়নি। তাছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সংস্কারের কোন পরিকল্পনা নেই। ফলে এ খাতে বাজেট বৃদ্ধি শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে মোটেই সহায়ক হবে না।

চতুর্থতঃ বিগত সরকারের সর্বশেষ বাজেটে কৃষি ভর্তুকি ছিল ১০০ কোটি টাকা। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে ৩০০ কোটি টাকা করেন। বর্তমান বাজেটে তা ৬০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। কিন্তু এই ভর্তুকি কিভাবে দেওয়া হবে, তার পরিকল্পনা নেই। ফলে এগুলো সব অকৃষক ও দলীয় ক্যাডাররাই যদি খেয়ে নেয়, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। দেশে ৩৩ লাখ একর খাস জমি রয়েছে। কিন্তু তার ১০ শতাংশও প্রকৃত ভূমিহীনরা পায়নি। এরশাদ শিকদার মার্কা লোকেরা সর্বত্র বেনামীতে এগুলো ভোগ করছে, একথা সরকার ভালভাবে জেনেও কিছু করার ক্ষমতা রাখে না কেবল দল ঠিক রাখার স্বার্থে। ঢাকার বড় বড় বস্তিতে যুগ যুগ ধরে বাস করা লোকগুলি এবং দেশের বড় বড় শহরে ও হাইওয়ের পাশে ছোট ছোট টোল ফেলে জীবন কাটানো ঐ ভূমিহীন ছিন্নমূল মানুষগুলো কি এদেশের নাগরিক নয়? ওদের জন্য বাজেটে কি কোন আশার আলো রয়েছে?

পঞ্চমতঃ বর্তমান বাজেটে প্রত্যক্ষ কর বাড়েনি। তবে ভ্যাটের আওতা বেড়েছে। ফলে স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়ীরাও ভ্যাটের আওতায় চলে আসবে। কিন্তু বেঁচে যাবে ধনিক শ্রেণী ও আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া লোকগুলো। অতএব সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী ধনিক শ্রেণীর এতে খুশী হওয়ারই কথা। নীরব গরীব শ্রেণী কখনো কথা বলে না। তারা কথা বলতে জানে না। তারা জানে কেবল শোষিত ও নির্যাতিত হ'তে ও নীরবে চোখের পানি ফেলতে। তাদের দীর্ঘশ্বাসে আল্লাহ্‌র গযবের আগুন জ্বলে ওঠে। তাঁর রহমতের দরিয়ায় ঢেউ ওঠে। তাই আসুন! আমরা দেখি অহি-র বিধানের আলোকে বর্তমান বাজেট কতটুকু কল্যাণমুখী।-

(১) আল্লাহ সূদকে চিরদিনের জন্য হারাম করেছেন। যা শোষণের হাতিয়ার এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যা আবশ্যিক পূর্বশর্ত। অথচ বর্তমান বাজেটে সূদকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। বরং ব্যয়ের খাতে শিক্ষার পরেই সর্বোচ্চ ১১% ব্যয় ধরা হয়েছে সূদ পরিশোধ খাতে। মজার কথা হ'লঃ আয়ের খাতে বৈদেশিক ঋণ হ'ল ১২% আর ব্যয়ের খাতে ঋণের সূদ পরিশোধ বাবদ খরচ হবে ১১% শতাংশ। তাহ'লে থাকলো মাত্র ১ শতাংশ। এর পরেও আমরা সূদ ছাড়তে পারছি না। আসল রোগের চিকিৎসা না করে ফলমূল খাওয়ালে যেমন রোগী সুস্থ হয় না, তেমনি সূদ-এর ক্যান্সারকে জিইয়ে রেখে সমাজদেহকে সুস্থ ও স্বচ্ছল করা যাবে না। (২) হারামের সকল পথ বন্ধ করে হালালের সকল পথ খুলে দেওয়াই হ'ল আল্লাহ্‌র নির্দেশ। কিন্তু বর্তমান বাজেটে কালো টাকা উপার্জনের পথ রুদ্ধ করার কোন নির্দেশনা নেই। দেশের চিহ্নিত ও ঘোষিত শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ক্যাডার ও দুর্নীতিবাজ সরকারী ও পুলিশ কর্মকর্তাদের যারা ইতিমধ্যেই আদালত কর্তৃক চিহ্নিত হয়ে গেছে, তাদের সকল সম্পদ বাযেয়াফত করলে সরকারের এক বছরের উন্নয়ন বাজেটের সংস্থান হয়ে যাবে। এরূপ করা শুরু হ'লে ভবিষ্যতে কেউ আর লুটেরা হ'তে সাহস করবে না। (৩) ইহুদী-খৃষ্টান ও কাফিরদের আন্তরিক বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমরা বিশ্বব্যাংক, আই,এম,এফ প্রভৃতি বহুজাতিক অমুসলিম আর্থিক সংস্থারূপী হিংস্র অক্টোপাসগুলির হাতে বন্দী হয়েছি অর্থ ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে। বর্তমান বাজেটের সাড়ে ৪৪ শতাংশ আয় আসবে বৈদেশিক সাহায্য থেকে। অধিকন্তু তাদেরই পাঠানো শতশত এনজিও-র সূদী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য স্থায়ীকরণ হচ্ছে এবং দৈনিক হাযার হাযার লোক খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে। যা আগামী দিনে ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরের ন্যায় পৃথক একটি খৃষ্টান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটানোর পটভূমি তৈরী করে চলেছে। সরকার এদেরকে যদি তাড়াতে নাও পারেন, অন্ততঃ উচ্চহারে ট্যাক্স বসালেও তা দিয়ে বাজেটের বিরাট অংশ পূরণ হ'ত।

এই সঙ্গে এটাও বলতে চাই যে, বিদেশী পরামর্শদাতা বাদ দিয়ে যথাসম্ভব দেশীয় মেধা কাজে লাগানোর দৃঢ় পদক্ষেপ নিন। বিজ্ঞানী নাজমুল হুদার ন্যায় আরও বহু বিজ্ঞান প্রতিভাকে উৎসাহিত করার জন্য বাজেটে অধিক ব্যয় বরাদ্দ করুন। কেননা এগুলি ব্যয় নয় বরং বিনিয়োগ।

পরিশেষে বলব, ট্রেনের টিকিট, মাছ ইত্যাদির উপর ট্যাক্স বাড়াবেন না। ভ্যাটের আওতা বাড়াবেন না। যাবতীয় বিলাস সামগ্রীর আমদানী ও বিপণন বন্ধ করুন। দেশীয় শিল্পকে উৎসাহিত করুন। আদমজী সহ হাযার হাযার বন্ধ কারখানাকে জীবন্ত করুন। শিল্প-কারখানায় বিভিন্ন দলীয় শ্রমিক সংগঠন বন্ধ করুন। অলস ও উদ্বৃত্ত লোকবল ছাটাই করুন। ইসলামী শ্রমনীতি অনুযায়ী শ্রমিকদের শিল্প মালিকানায় অংশ দিন। দেখবেন চুরি আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। কৃষিতে বর্তমান বাজেটে বরাদ্দকৃত ৮% সূদ বাতিল করে বিনা সূদে কৃষি ঋণ দিন। কোমর ভাঙ্গা কৃষককে ভর্তুকির মাধ্যমে ঠেকা দিয়ে দাঁড় করানোর সাথে সাথে কৃষি পণ্যের যথার্থ মূল্যের নিশ্চয়তা দিন। কৃষি জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও বহুমুখী ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিন। কৃষিপণ্য ও ফলমূল সংরক্ষণের জন্য সর্বত্র প্রয়োজনমত হিমাগার তৈরী করুন ও এসব খাতে বাজেট বরাদ্দ করুন। বেকার তরুণদের কাজ দিন।

পরিশেষে বলব, শুধু অর্থ বাজেট নয়, সার্বিক জাতীয় উন্নয়নের বাজেট দিন। যেখানে আর্থিক উন্নয়ন ছাড়াও জনগণের নৈতিক উন্নয়নের বিষয়টিও অগ্রাধিকার পাবে। এজন্য সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক সমাজ, আলেম সমাজ, মসজিদের ইমামগণ এবং অন্যান্য ধর্মের পুরোহিত-পাত্রীদের নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা উচিত। সাথে সাথে এদের নৈতিক স্খলণে বিশেষ ধরনের শাস্তির ব্যবস্থাও থাকা উচিত। মোট কথা বাজেট যেন স্রেফ আমাদের পেটের কথা না বলে। বরং সেখানে যেন আমাদের মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের কথাও প্রতিফলিত হয়।

পরিশেষে দশ দশবার দেশের বাজেট পেশ করার অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী আমাদের প্রবীণ ও অভিজ্ঞ অর্থমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং দাবী জানাই যেন জীবন সায়াহ্নে এসে আগামীতে তিনি সূদমুক্ত একটি সুষম ও শোষণহীন এবং জাতীয় উন্নয়নের বাজেট আমাদেরকে উপহার দিয়ে যান। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! (স.স)।

ক্বিয়ামতের কিছু আলামত

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ - يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَمَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ-

'হে মানব মণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের ভূকম্পন অতীব ভয়ংকর বিষয়'। 'যেদিন তোমরা দেখবে স্তন্যদায়িনী মা তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিস্মৃত হবে, গর্ভবর্তী নারীর গর্ভপাত ঘটে যাবে, মানুষকে তোমরা মাতাল সদৃশ দেখতে পাবে, অথচ তারা মাতাল নয়। আসলে আল্লাহ্র শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' *(হজ্জ ১-২)*।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত আয়াতে ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় কালের বিশ্ব পরিস্থিতির কিছু নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে। আর এটি হ'ল 'ক্বিয়ামতে কুবরা' বা বড় ক্বিয়ামতের ঘটনা। মানুষের আবাসিক ঠিকানা মোট ৪টি। প্রতিটি ঠিকানা তার পূর্বেরটির চাইতে বড়। ১- মায়ের গর্ভে থাকাকালীন জীবন। যেখানে সে দশ মাস থাকে এবং অংকুর থেকে বেড়ে ওঠে। ২- ভূমিষ্ট হওয়া থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দুনিয়াবী জীবন। যেখানে সে পরবর্তী জীবনের জন্য পাথেয় সঞ্চয় করে। ৩- মৃত্যু থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত বারযাখী জীবন। এটি প্রথম দু'টি জীবন থেকে দীর্ঘ। এই জীবনে সে দুনিয়াবী জীবনের ভাল-মন্দ ফলাফলের কিছু নমুনা ভোগ করে। এজন্য একে 'ক্বিয়ামতে ছুগরা' বা 'ছোট ক্বিয়ামত' বলা হয়, যা মৃত্যুর সাথে সাথে শুরু হয়ে যায়। ৪- দারুল ক্বারার বা চিরস্থায়ী জীবন, যা জান্নাতে বা জাহান্নামে অতিবাহিত হবে। এখানে সে দুনিয়াবী জীবনের হিসাব-নিকাশ শেষে চূড়ান্ত ফল লাভ করবে। প্রতিটি জীবনের বৈশিষ্ট্য, আকৃতি ও প্রকৃতি অন্য জীবন থেকে পৃথক। একটির সাথে অন্যটির কোনরূপ সাদৃশ্য নেই। প্রতিটি জীবনের পৃথক বৈচিত্র সৃষ্টির একমাত্র ক্ষমতাবান সত্তা হ'লেন আল্লাহ। দুনিয়ার এ জীবনে বসে অন্য জীবনের চিত্র জানা নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ্র অহী ব্যতীত সম্ভব নয়। তাই ক্বিয়ামত প্রাক্কালের ও পরবর্তী কালের অদৃশ্য সংবাদাদী জানার একমাত্র মাধ্যম হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। ক্বিয়ামত পূর্বকালের ঘটনাবলী ও বিভিন্ন আলামত সম্পর্কেও কুরআন-হাদীছে কিছু কিছু বর্ণিত হয়েছে। যাতে বান্দা হুঁশিয়ার হতে পারে। নিম্নে তার কিছু নমুনা পেশ করা হ'ল, যা আমাদের যামানায় এসে গেছে।

৯ হিজরী মোতাবেক ৬৩১ খৃষ্টাব্দে তাবূক যুদ্ধের সময় ছাহাবী 'আওফ বিন মালেককে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন তিনি একটি চামড়ার তৈরী তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করছিলেন,

قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَهُوَ فِيْ قُبَّةٍ مِّنْ أَدَمٍ فَقَالَ اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَوْتِيْ ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ ثُمَّ مُوْتَانٌ يَّأْخُذُ فِيْكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِيْنَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِتْنَةٌ لاَ يَبْقَى بَيْتٌ مِّنَ الْعَرَبِ إِلاَّ دَخَلَتْهُ ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُوْنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِيْ الْأَصْفَرِ فَيَغْدِرُوْنَ فَيَأْتُوْنَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا-

ক্বিয়ামতের পূর্বে ৬টি নিদর্শনকে তোমরা গণনা করঃ (১) আমার মৃত্যু (২) বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয় (৩) ব্যাপক মহামারী, যা তোমাদেরকে বকরীর মড়কের ন্যায় আক্রমণ করবে (৪) ধন-সম্পদের প্রাচুর্য। যখন কোন ব্যক্তিকে একশত স্বর্ণমুদ্রা দান করলেও সে (নগণ্য ভেবে) তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে (৫) এমন এক ফিৎনা দেখা দিবে, যা আরবের ঘরে ঘরে প্রবেশ করবে (৬) রোমকদের সাথে তোমাদের সন্ধি হবে। অতঃপর তারা চুক্তি ভঙ্গ করবে ও তোমাদের বিরুদ্ধে ৮০টি পতাকা নিয়ে মুকাবিলায় আসবে। প্রতিটি ঝাণ্ডার অধীনে ১২,০০০ সৈন্য থাকবে'।[১] উক্ত হাদীছে বর্ণিত সবগুলি লক্ষণ ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী প্রকাশ পাবে তা নয়, বরং আগে পিছেও হ'তে পারে।

এক্ষণে উক্ত নিদর্শন গুলির প্রথমটি সম্পন্ন হয়ে গেছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছে চান্দ্র বর্ষ হিসাবে ১১ হিজরী মোতাবেক ১২ই রবীউল আউয়াল সোমবার সকালে চাশতের সময় ৬৩ বছর ৪দিন বয়সে।[২] তিনি মোট ৮১৫৬ দিন ও ২২,৩৩০ ঘন্টা দুনিয়াবাসীর নিকটে রিসালাত ও নবুঅতের দায়িত্ব পালন করেন।[৩] সৌরবর্ষ হিসাবে ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন তারিখে। উল্লেখ্য যে, তাঁর জন্ম তারিখ ছিল ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার মোতাবেক ২২শে এপ্রিল ৫৭১ খৃষ্টাব্দে।[৪]

দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয় সম্পন্ন হয়েছে হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময়ে ১৫ হিজরী মোতাবেক ৬৩৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। অতঃপর একটানা মুসলিম

১. *বুখারী, মিশকাত হা/৫৪২০; ঐ,বঙ্গানুবাদ, হা/৫১৮৬ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায় 'মালাহেম বা তুমুল সংঘর্ষ' অনুচ্ছেদ।*
২. *আর-রাহীকুল মাখতূম পৃঃ ৪৬৯।*
৩. *মানছূরপুরী, রাহমাতুল লিল 'আলামীন ২/১৬।*
৪. *ঐ, ২/১৬; ঐ, ২/৩৬৮।*

শাসনে থাকার পর ৪৯৩হিঃ/১০৯৯ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টান অধিকারে চলে যায়। ৯১ বৎসর খৃষ্টান অধিকারে থাকার পর ৫৮৪হিঃ/১১৮৭ খৃষ্টাব্দে ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর সময়ে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পুনরায় বিজিত হয়। অতঃপর ১৯৬৭ সালে তা পুনরায় ইহুদী-খৃষ্টান লবীর অধীনস্ত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ চূড়ান্ত বিজয় সত্ত্বর অপেক্ষা করছে। ৩নংটি এখনো আসেনি। তবে এইড্স সার্স ও এনথ্রাস মহামারীর আতংক পৃথিবীকে ভীত করে তুলেছে। ৪নংটি মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই এসে গেছে। যদিও পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এখনও দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে। এরি মধ্যে বাংলাদেশের মত গরীব দেশেও মাঠে কাজের জন্য দিনমজুর পাওয়া যায় না। বাড়ীতে কাজের মেয়ে বা কাজের ছেলে পাওয়া যায় না। বরং বলা যায়, গরীব শ্রেণীর লোকেরাই এখন গাড়ী-বাড়ীর মালিক হচ্ছে। ধনিকশ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা হাসফাস করছে।

৫নংটি অতি স্বাভাবিকভাবেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে মূলতঃ দু'টি কারণে। একঃ ধর্ম নিরপেক্ষতা ও দুইঃ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা। প্রথমটির কারণে মানুষ ধর্মহীন ও বস্তুসর্বস্ব হ'তে চলেছে। আল্লাহ ভীতি ও আখেরাতে জবাবদিহীতার দায়িত্বানুভূতি থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ ক্রমে পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হচ্ছে। দ্বিতীয়টির কারণে নেতৃত্বের লড়াই ঘরে ঘরে শুরু হয়েছে। পূর্বযুগে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হ'ত। প্রজারা মুক্ত থাকত। আর এখন ইলেকশনের নামে ভাইয়ে-ভাইয়ে, পিতা-পুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে, মালিক-শ্রমিকে, সম্মানী-অসম্মানীতে ঘরে-ঘরে নেতৃত্ব লাভের যুদ্ধ চলছে। আগে রক্ত ঝরত কেবল যুদ্ধের সময়। আর এখন রক্ত ঝরে সারা বছর। আতংকে দিন কাটে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তির লেলানো সশস্ত্র ক্যাডারদের ভয়ে। ফলে যেখানেই ইলেকশন, সেখানেই গ্রুপিং সেখানেই সন্ত্রাস, সেখানেই ধ্বংস।

৬নংটির সূচনা হিসাবে আমরা ২০০৩ সালের ২০শে মার্চে ইঙ্গ-মার্কিন খৃষ্টান চক্র কর্তৃক ইরাক দখলকে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করতে পারি। এখন তারা সঊদী আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসমৃদ্ধ অন্যান্য দেশগুলি দখলের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তার প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে ঐসব দেশের অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস করে সে স্থলে অসংখ্য দল ও মীরজাফর সৃষ্টির জন্য বহু দলীয় গণতন্ত্রের নোসখা প্রেরণ করছে। ইতিপূর্বে তারা কামাল পাশাকে দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষ পান করিয়ে ১৯২৪ সালে ওছমানীয় খেলাফত ধ্বংস করেছে অতঃপর ভাষা ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের শ্লোগান তুলে ঐক্যবদ্ধ ইসলামী খিলাফতকে এযাবত ৫৬টি দুর্বল রাষ্ট্রে বিভক্ত করেছে। এখন ঐ রাষ্ট্রগুলিকে ভিতর থেকে ধ্বংস করার জন্য 'গণতন্ত্র' নামক রাজনৈতিক মাদক প্রয়োগ করেছে। যাতে ওরা চিরকাল নেতৃত্বের লোভে আপোষে দলাদলি ও মারামারি করে শেষ হয়ে যায় ও চিরকাল বিশ্বব্যাংক, আই,এম,এফ ও বহুজাতিক আর্থিক সংস্থাগুলির হাতে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

তবে অন্য একটি হাদীছের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যের জন্য ভয়ংকর দুঃসংবাদ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, মধ্যপ্রাচ্য হ'ল, প্রধান প্রধান নবীগণের আগমনস্থল ও মধ্যপ্রাচ্যই হ'ল আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নে'মত সমূহের কেন্দ্রভূমি। বলা হয়েছে যে, আগামী দিনে হেজাযের পূর্ব দিকের দেশসমূহ হ'তে ফিৎনার উদ্ভব ঘটবে[৫] এবং তা হবে পৃথিবী ধ্বংসের কারণ। তবে হেজায ভূমিতে ঈমান থাকবে[৬] এবং মক্কা-মদীনা দাজ্জালের ফিৎনা হ'তে মুক্ত থাকবে।[৭]

মধ্যপ্রাচ্যের নে'মতের ভাণ্ডার ও তার অনিবার্য পরিণতিতে ঘটিতব্য ধ্বংসের দুঃসংবাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيْضَ حَتَّى يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكوةَ مَالِهِ فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَ حَتَّى تَعُوْدَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوْجاً وَأَنْهَارًا، رواه مسلم-

'অতদিন পর্যন্ত ক্বিয়ামত হবে না, যতদিন না আরব ভূমি সবুজ-শ্যামল ও বাগ-বাগিচায় পরিণত হবে এবং প্রবাহিত নদ-নদীতে রূপান্তরিত হবে'।[৮] আবু হুরায়রাহ (রাঃ) প্রমুখাত অন্য বর্ণনায় এসেছে,

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسُرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِّنْ ذَهَبٍ يَّقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَّ تِسْعُوْنَ وَ يَقُوْلُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ لَعَلِّيْ أَكُوْنُ أَنَا الَّذِيْ أَنْجُوْ، رواه مسلم-

'অতদিন ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না, যত দিন না ফোরাত (ইউফ্রেতিস) নদী তার তলদেশে রক্ষিত স্বর্ণের পাহাড় উন্মুক্ত করে দিবে। ঐ সম্পদ নিয়ে রক্তাক্ত সংঘর্ষে শতকরা নিরানব্বই জন লোক নিহত হবে। প্রত্যেকেই ভাববে, সম্ভবতঃ আমিই বেঁচে যাব (এবং আমিই সব ভোগ করব)।[৯]

মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিগুলিতে এখন কৃষিকার্য শুরু হয়েছে এবং উন্নত মানের গম, সবজি ও সবজি জাত ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। সুপেয় পানির কোন অভাব এখন তাদের নেই। সর্বোপরি সেখানের মাটির নীচে যে তরল সোনা তথা তৈল সম্পদের বিপুল ভাণ্ডার উন্মোচিত হয়েছে, তা দখল করার জন্যই বুশের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ইহুদী-খৃষ্টানচক্র প্রথমে ইরাকে হামলা চালিয়েছে এবং ভবিষ্যতে অন্য রাষ্ট্রগুলিতে চালাবে। চূড়ান্ত ধ্বংসকারী যুদ্ধের সেই দিন গুলি অবশ্যই এখনও দূরে। তবে ইতিমধ্যে তার সূচনা হয়ে গেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

---

৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬২৬০।*
৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৬১।*
৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮২।*
৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৪০; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫২০৬ 'ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ' অনুচ্ছেদ।*
৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৪৩; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫২০৯।*

এক সময় যেমন মানুষ সারা পৃথিবী থেকে তৎকালীন পৃথিবীর ধনভাণ্ডার ও জ্ঞানভাণ্ডার মুসলিম স্পেনে *(৯২-৮৯৭হিঃ/৭১১-১৪৯২খৃঃ=৭৮১ বছর)* ছুটে যেত, বর্তমানে তেমনি পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ ধন-সম্পদে ভরপুর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে ছুটে চলেছে। সেদিনও মুসলিম স্পেনকে ধ্বংস করেছিল হিংসুক খৃষ্টান নেতারা। আজও মুসলিম অধ্যুষিত মধ্যপ্রাচ্যকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে ইহুদী-খৃষ্টান আন্তর্জাতিক শত্রুরা। অসাম্প্রদায়িক নামধারী ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতন্ত্রী মুসলিম নেতাদের ঘুম ভাঙবে কি?

হাদীছটির অবশ্যম্ভাবী সামাজিক চিত্রঃ

এ প্রসঙ্গে অন্য একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ وَيَكْثُرَ الزِّنَا وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ إِمْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ –

অনুবাদঃ আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল এই যে, (১) ইল্ম উঠে যাবে ও মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে (২) যেনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে (৩) মদ্যপান বৃদ্ধি পাবে (৪) পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে ও মহিলাদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এমনকি ৫০ জন মহিলার জন্য অভিভাবক হবে মাত্র একজন পুরুষ'। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, ইল্ম কমে যাবে ও মূর্খতা প্রকাশিত হবে' অর্থাৎ সর্বত্র মূর্খতা বিজয় লাভ করবে।[১০]

হাদীছটিতে ইতিপূর্বে 'আওফ বিন মালেক (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীরই অবশ্যম্ভাবী সামাজিক চিত্র অংকিত হয়েছে। হাদীছটিতে বর্ণিত চারটি বিষয়ের প্রথমটি হ'ল ইল্ম উঠে যাওয়া। ইল্ম উঠে যাওয়া বলতে কিতাব ও সুন্নাহ্র ইল্ম উঠে যাওয়া বুঝানো হয়েছে। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন,

والمراد بالعلم العلم الشرعى الذى يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر عباداته ومعاملاته، ... ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه،

'ইল্ম বলতে শরী'আতের ইল্ম বুঝানো হয়েছে, যা মুমিন ব্যক্তির উপরে অপরিহার্য ইবাদাত ও মু'আমালাত তথা ধর্মীয় ও বৈষয়িক বিষয় সমূহের জ্ঞান দান করে।... আর এগুলির উৎস কেন্দ্র হ'ল তাফসীর, হাদীছ ও ফিক্বহ'।[১১]

১০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৪৩৭; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫২০৩ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়, 'ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ' অনুচ্ছেদ ২।*

১১. *ফাৎহুলবারী 'ইল্ম' অধ্যায় ১/১৭০।*

কুরআন ও সুন্নাহ হ'ল অভ্রান্ত জ্ঞানের মূল উৎস। সুন্নাহ্র শাব্দিক রূপ হ'ল হাদীছ, যা লিখিত ও সংকলিত আকারে জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার হিসাবে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। আর 'হাদীছ' বলতে ছহীহ হাদীছ বুঝায়, যা বিশুদ্ধরূপে রাসূল (ছাঃ) থেকে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। কুরআন ও হাদীছ উভয়টিই আল্লাহ্র অহী। যার হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করেছেন' *(হিজর ৯, ক্বিয়ামাহ ১৬-১৯)*। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ইল্মকেই প্রকৃত ইল্ম বলার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল এই যে, এই ইল্ম মানুষকে তার প্রভুর সন্ধান দেয় ও তাকে সর্বদা আখেরাতে জবাবদিহীতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে মানুষ প্রকৃত মানুষে পরিণত হয়। যদিও কুরআন ও সুন্নাহ্র মধ্যে বৈষয়িক সকল জ্ঞানের উৎস নিহিত রয়েছে এবং বলা চলে যে, আধুনিক বিজ্ঞানের মূল উৎস ধারাই হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ। যাকে রিসার্চ করেই এক সময় বাগদাদ ও ইউরোপিয় মুসলিম স্পেন সারা বিশ্বের বিজ্ঞান জগতে নেতৃত্ব দিয়েছিল। আর সেখান থেকেই বিজ্ঞানের ইল্ম নিয়ে আজকের পাশ্চাত্য জগত বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে। কিন্তু তারা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত বিজ্ঞানকে গ্রহণ করলেও তার তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে গ্রহণ করেনি। সেকারণ তারা দুনিয়াবী শক্তিতে উন্নতি করলেও মানবিক শক্তিতে প্রায় শুন্যের কোঠায় নেমে গিয়েছে। এখন তাদের চূড়ান্ত ধ্বংসের পালা।

ইল্ম উঠে যাওয়ার মৌলিক কারণ তিনটিঃ (১) ইল্ম অর্জনের মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হওয়া (২) ইল্মকে দুনিয়া হাছিলের মাধ্যম গণ্য করা (৩) ইল্মকে দুনিয়াদারদের মনোরঞ্জনে ব্যয় করা। এ কারণগুলি ইতিপূর্বে সকল যুগেই ছিল। তবে ক্বিয়ামত প্রাক্কালে নিঃসন্দেহে তা বৃদ্ধি পাবে। আমরা এখন সে যুগেই বাস করছি। অতএব বর্তমান ইল্ম-সংকটে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। আখেরাতের সন্ধানী চিন্তাশীল মুমিনদের সত্যিকারের মুত্তাক্বী ও যোগ্য আলেম সন্ধান করতে হবে ও তাঁদের কাছ থেকেই সমাধান নিতে হবে।

প্রথমোক্ত কারণটির বিষয়ে আমরা বলতে পারি যে, লেখাপড়ার উদ্দেশ্য হ'ল দ্বীনের ভিত্তিতে জ্ঞানার্জন করা ও আখেরাতমুখী জীবন গড়া। কিন্তু বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে আজকাল লেখাপড়ার উদ্দেশ্য হয়েছে দুনিয়া অর্জন করা। ফলে পিতা-মাতারাও তাদের সন্তানদের ঐসব বিষয়ে লেখাপড়া শিখাতে চান, যে সব বিষয় শিখলে সন্তান অধিকহারে দুনিয়া অর্জনে সক্ষম হয়। সরকারও শিক্ষাকে দ্বীনী ও দুনিয়াবী দু'ভাগে ভাগ করে ফেলেছেন। অথচ মুসলমানের দ্বীনকে তার দুনিয়া থেকে পৃথক করা হয়নি। বরং তার দ্বীনের আলোকেই তার দুনিয়া রঞ্জিত হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়টির বিষয়ে বলা চলে যে, ইল্মকে এখন আখেরাত হাছিলের মাধ্যম গণ্য না করে দুনিয়া হাছিলের মাধ্যম গণ্য করা হচ্ছে। ফলে শিক্ষিত লোকেরাই এখন অধিক দুনিয়াদার। তারা বিনা দ্বিধায় মানুষের রক্ত শোষণ করে।

অথচ যে ইল্‌ম দিয়ে তিনি সূদের হিসাব কষেন, ঐ ইল্‌ম দিয়ে তিনি সূদের বিরুদ্ধে ব্যবসার হিসাব করতে পারেন। চাহিদামত ঘুষ-বখশিশ না দিলে অফিসের ফাইল নড়ে না। বড় অংকের ফিস বা কন্ট্যাক্ট পরিশোধ না করলে ডাক্তারের ছুরিও চলে না। আর পুলিশ বাহিনীর কিছু অংশ তো রীতিমত সরকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত সন্ত্রাসী ও নিয়মিত চাঁদাবাজ। অথচ যে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তিনি দুনিয়া হাছিল করছেন, ঐ অস্ত্র দিয়েই তিনি দুষ্টকে দমন করে আখেরাত হাছিল করতে পারতেন।

আদালতের কোন কোন বিচারক ও তাদের সংশ্লিষ্টরা ঘুষ-বখশিশের দোকান খুলে বসে আছেন। রাজনীতি ও সমাজ নেতৃত্বের অধিকাংশ ক্ষেত্রগুলি এখন দুনিয়া সর্বস্ব লোকদের হাতে কুক্ষিগত হয়ে গেছে। ফলে দুর্নীতিবাজরা মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে। আখেরাতের সন্ধানীরা সর্বত্র মার খাচ্ছে। যদিও শিক্ষিতের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিঃসন্দেহে উক্ত শিক্ষা হ'ল আখেরাত বিমুখ বস্তুবাদী শিক্ষা। যা দিয়ে মানুষের এমনকি সাধারণ পশু-পাখিরও কোন কল্যাণ হয় না। কারণ একজন শিক্ষিত মুমিন ব্যক্তি এ হাদীছ জানেন যে, إِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ– 'তোমরা যমীনবাসীর উপরে রহম কর। তাহ'লে আসমানবাসী (আল্লাহ) তোমাদের উপরে রহম করবেন'।[১২] ফলে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি হিসাবে সে একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালের প্রতিও রহম করে।

কেউ বলেন যে, দেশে ও বিদেশে এত বিরাট বিরাট মাদরাসা ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ থাকা সত্ত্বেও দ্বীনী ইল্‌ম কিভাবে উঠে যাবে? জবাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দিয়েছেন এভাবে যে, إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوْسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوْا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্য থেকে ইল্‌ম টেনে বের করে নিবেন না। বরং আলেমগণকে উঠিয়ে নেবার মাধ্যমেই ইল্‌ম উঠিয়ে নিবেন। অবশেষে যখন তিনি দুনিয়ায় কোন আলেম বাকী রাখবেন না, তখন লোকেরা মূর্খদের নেতারূপে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হ'লে তারা বিনা ইল্‌মে ফৎওয়া দিবে। ফলে তারা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকে পথভ্রষ্ট করবে'।[১৩] আহমাদ, বুখারী ও মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ ও আবু মূসা আশ'আরী প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, إِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ لأَيَّامًا يَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ وَيُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ وَالْمَرْجُ وَهُوَالْقَتْلُ– 'ক্বিয়ামত পূর্বকালে মূর্খতা নাযিল হবে, ইল্‌ম উঠে যাবে, ঝগড়া-ঝাটি ও হত্যাকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে'।[১৪]

এ যুগে উক্ত হাদীছের বাস্তবতা করুণভাবে ফুটে উঠেছে। অনেকে বড় বড় ইসলামী ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরে এলেও দেখা যাচ্ছে যে, তাদের মধ্যে অহংকার ও ঝগড়া বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের অনেকের ঘর ভর্তি ধর্মীয় কিতাবাদি দেখা যায়। কিন্তু পড়াশুনা ও গবেষণার অভ্যাস নেই। দুনিয়াবী ব্যস্ততা তাদেরকে পেয়ে বসেছে চূড়ান্তভাবে। ফলে আল্লাহভীরু, যোগ্য, দ্বীনদার ও সমাজদরদী আলেমের সংখ্যা কদাচিৎ পাওয়া যায়।

ইল্‌ম উঠে যাওয়ার তৃতীয় কারণ হ'ল আলেমদের দুনিয়াদার লোকদের পিছনে ছোটা ও তাদের সাথে উঠাবসা করা। ইহুদী-নাছারাদের ধ্বংসের অন্যতম কারণ ছিল এটা। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) প্রমুখাত বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَمَّا وَقَعَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ فِى الْمَعَاصِىْ نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا فَجَالَسُوْهُمْ فِىْ مَجَالِسِهِمْ وَآكَلُوْهُمْ وَشَارَبُوْهُمْ فَضَرَبَ اللهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَلَعَنَهُمْ ... 'বনু ইসরাঈল যখন পাপাচারে লিপ্ত হ'ল, তখন তাদের আলেম ও দরবেশগণ প্রথমদিকে এইসব অন্যায়ের প্রতিবাদ করত। কিন্তু লোকেরা বিরত না হওয়ায় পরে তারা দুষ্টমতি সমাজ নেতা ও বড়লোকদের সাথে উঠাবসা ও খানাপিনা করত। ফলে আল্লাহ তাদের পরস্পরের অন্তরকে পাপাচারে কলুষিত করে দেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের উপরে লা'নত করেন... বলেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন নিহিত, তোমরা অতক্ষণ পর্যন্ত (আল্লাহ্‌র শাস্তি হ'তে) রেহাই পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা যালিম ও পাপীদেরকে তাদের পাপ কার্যে বাধা প্রদান না করবে'।[১৫] মুসলিম উম্মাহ্‌র সেরা আলেমগণ কখনোই প্রশাসনিক পদ পাওয়ার জন্য শাসকদের পিছনে ঘুরতেন না। তারা কখনোই কোন ধনী লোকের করুণার ভিখারী হ'তেন না। যদিও ব্যতিক্রম সকল যুগেই ছিল, এ যুগেও আছে। তবে এ যুগের আলেমদের ব্যতিক্রমটা হ'ল উল্টামুখী। অর্থাৎ এ যুগে তাক্বওয়াশীল যোগ্য আলেমের সংখ্যা নিতান্তই হাতে গণা মাত্র। ফলে মানুষ মূর্খ পীর-ফকীর ও দুনিয়াদার মুফতীদের শরণাপন্ন হচ্ছে। তারা নিজেরা ডুবছে, অন্যকেও ডুবাচ্ছে। দ্বীন ও দুনিয়া সবই খোয়াচ্ছে। এভাবেই প্রকৃত ইল্‌ম উঠে যাচ্ছে।

১২. *আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯৬৯; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৭৫২; ছহীহ তিরমিযী হা/১৫৬৯।*
১৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৬; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৬ 'ইল্‌ম' অধ্যায়।*
১৪. *মিরক্বাত ১০/১৬৩।*
১৫. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪৮; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৯২১ 'ন্যায় কাজের নির্দেশ' অনুচ্ছেদ; তিরমিযী হাদীছটিকে 'হাসান' বলেছেন। কিন্তু আলবানী 'যঈফ' বলেছেন; হেদায়াতুর রুওয়াত ৪/৪৮৯ পৃঃ।*

উল্লেখ্য যে, ইল্‌ম উঠে যাওয়া অর্থ ইল্‌ম কমে যাওয়া। একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া নয়, যা অন্য একটি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি হ'ল যেনা-ব্যভিচারের ব্যাপ্তি লাভ। এটাও আখেরাত চিন্তাহীনতার ফল ও বস্তুবাদী আক্বীদার পরিণতি। সমাজের মানুষ যত বেশী ধর্মহীন হবে, তত বেশী বস্তুবাদী ও দুনিয়াদার হবে। ফলে দুনিয়া ভোগের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি চরিতার্থের লালসা তার মধ্যে জোরদার হবে। যেনা-ব্যভিচারের বিষয়টি মানুষের একটি আদিম প্রবৃত্তি। সুযোগ পেলেই এবং নির্লজ্জ হ'তে পারলেই তার পক্ষে এটা সম্ভব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَاشِئْتَ– 'যখন তুমি নির্লজ্জ হবে, তখন তুমি যা খুশী তাই কর'।[১৬] আধুনিক পর্ণো সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র জগত মূলতঃ যৌনতাকে অবলম্বন করেই চলছে। রাস্তাঘাটে, রিকশায় ও পণ্যের বিজ্ঞাপনে অর্ধনগ্ন নারীমূর্তিই প্রধান উপজীব্য। টিভি, ভিসিআর, ভিসিপিতে নীল ছবির অবাধ প্রচার চলছে। কয়েকটি আন্তর্জাতিক চ্যানেল কেবল নগ্নতার প্রসারেই নিয়োজিত রয়েছে। যা দেখলে যৌনতা উদ্দীপিত হ'তে বাধ্য। ধর্মীয় শিক্ষাহীন তরুণ সমাজ দ্রুত অধঃপাতে যাচ্ছে এসবের কারণে।

সেই সাথে যোগ হয়েছে দেশের দুর্বল প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থা। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সমাজ ব্যবস্থায় পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যেনা-ব্যভিচারে কোন দোষ নেই। দোষ রয়েছে কেবল যবরদস্তি ব্যভিচারে বা ধর্ষণে। ফলে তাদের সমাজ এখন পশুর সমাজে পরিণত হয়েছে। সম্ভবতঃ সেদেশের কোন সন্তান হলফ করে বলতে পারবে না যে, তাদের প্রকৃত পিতা কে?

আমাদের দেশেও একই বস্তুবাদী চিন্তাধারা দিন দিন প্রবল হ'তে থাকায় ধর্মীয় বন্ধন ক্রমেই শিথিল হচ্ছে এবং বেড়ে চলেছে যৌন অপরাধ সমূহ। দেশ যেহেতু বৃটিশ আইনে শাসিত হচ্ছে, সেহেতু আইনগত বাধ্যবাধকতা এক্ষেত্রে নামসর্বস্ব। আর আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা পুলিশ বিভাগ তো আরো দুর্বল। আইনের ব্যাখ্যাতা ও অপরাধের বিচার ক্ষেত্র তথা আদালতে এখন বিচার বিক্রি হচ্ছে টাকার বিনিময়ে। অন্ততঃ নিম্ন আদালতে এর ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে বলে ভুক্তভোগী মহলের অভিমত। পত্র-পত্রিকায় এসবের রিপোর্টও কম দেখা যায় না। আশ্চর্যের বিষয় হ'ল এই যে, জনগণের ভোটে নির্বাচিত এম,পিদের কখনো এসবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'তে দেখা যায় না। মহিলা প্রধানমন্ত্রীগণ বিগত দু'দশক ধরে দেশ চালাচ্ছেন। অথচ এসবের বিরুদ্ধে তাদের কোন কথাও শোনা যায় না। ফলে নারী নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড দিন দিন বেড়েই চলেছে অপ্রতিহত গতিতে।

তৃতীয় বিষয়টি হ'ল মদ্যপান। ইসলাম যাবতীয় প্রকারের মদ ও নেশাজাত দ্রব্যকে হারাম ঘোষণা করেছে। সরকারী আইনেও এটা নিষিদ্ধ। অথচ দেশে চলছে দেদারছে মদ ও মাদকতার রমরমা ব্যবসা। কারণ একটাই, মানুষের আক্বীদা-বিশ্বাসে আখেরাতের চিন্তা উঠে গিয়ে সেখানে দুনিয়াবী ভোগ-লালসার চিন্তা স্থান করে নিয়েছে। মদ হ'ল সকল পাপের উৎস। এটা যখন সহজলভ্য হবে, তখন সকল পাপই সহজলভ্য হবে। হয়েছেও তাই। বিগত সভ্যতা সমূহ ধ্বংসের মূল কারণ ছিল মদ ও নারী। দেশে এখন এদু'টিই সহজ লভ্য। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। দেশের প্রশাসন ও নেতৃবৃন্দ কি এসব মূল বিষয়গুলোর দিকে নযর দিবেন? নাকি সর্বদা ভোটের পলিটিক্স ও নেতৃত্বের কোন্দলেই জীবনপাত করবেন?

চতুর্থ বিষয়টি হ'ল পুরুষের সংখ্যাল্পতা। এর অর্থ এটা নয় যে, একজন পুরুষের ৫০ জন স্ত্রী হবে। বরং এর অর্থ হ'ল একজন পুরুষের অভিভাবকত্বে বহুসংখ্যক নারী থাকবে। সে নারী তার স্ত্রী, মা, বোন, খালা, ফুফু যে কেউ হ'তে পারে।[১৭] আল্লাহ বলেন, إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ– 'আমরা সবকিছুকে পরিমাণমত সৃষ্টি করেছি *(ক্বামার ৪৯)*। মানুষ নিজে সেখানে বিপর্যয় ঘটায়। যুদ্ধ-বিগ্রহে সাধারণতঃ পুরুষ নিহত হয় বেশী। আখেরী যামানায় যুদ্ধ-বিগ্রহ বেশী হবে এবং তাতে ব্যাপকভাবে পুরুষ নিধন হবে। আর তার ফলে পুরুষের সংখ্যাল্পতা হবে। তাছাড়া চাকুরী-বাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত ইত্যাদি কাজে পুরুষেরা বাইরে সময় কাটায় বেশী। আধুনিক যান্ত্রিক পরিবহনের হাতে তারা থাকে যিম্মী। ফলে একেকটি এক্সিডেন্টে একাধিক কেন একটিমাত্র লঞ্চ ডুবিতে একসাথে ৮০০-তের অধিক লোকের মৃত্যুর রেকর্ডও বাংলাদেশে রয়েছে। এভাবেও সমাজে পুরুষের কমতি ঘটছে নিরন্তর। বর্তমান বিশ্বে কোন কোন অঞ্চলের নাম শোনা যায়, যেখানে পুরুষের সংখ্যা নিতান্তই কম ও নারীর সংখ্যা অনেক গুণ বেশী। রাসূলের এ ভবিষ্যদ্বাণী ইতিমধ্যেই কোন কোন দেশে বাস্তবায়িত হ'তে শুরু করেছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলির নারী ও পুরুষের সংখ্যাগত হারটা জানা গেলে এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য পেশ করা যেত।

পরিশেষে বলব, ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ একে একে প্রকাশিত হচ্ছে। অতএব আখেরাতে মুক্তিকামী ভাই-বোনদের হুঁশিয়ার হওয়া আবশ্যক। যাতে ঐসব ধ্বংসকারী আমল থেকে আমরা নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারি এবং স্রেফ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পূর্ণ ইখলাছের সাথে নেক আমল করে দুনিয়ার এ সাময়িক পরীক্ষাগার থেকে বের হয়ে পরবর্তী বারযাখী জীবনে সফলতার সাথে প্রবেশ করতে পারি। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

---

১৬. বুখারী, মিশকাত হা/৫০৭২; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৮৫১ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'কোমলতা, লাজুকতা ও সচ্চরিত্রতা' অনুচ্ছেদ।

১৭. মিরক্বাত ১০/১৬৩।

নিঃস্ব কে?

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوْا: اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ يَّأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَوةٍ وَيَأْتِيْ قَدْ شَتَمَ هَذَا وَ قَذَفَ هَذَا وَ أَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَي هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَي مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، رواه مسلم-

অনুবাদঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? ছাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই নিঃস্ব, যার টাকা-পয়সা ও ধন-দৌলত কিছু নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি নিঃস্ব হবে, যে ব্যক্তি দুনিয়া হ'তে ছালাত, ছিয়াম ও যাকাত আদায় করে আসবে এবং সাথে সাথে ঐ সমস্ত লোকেরাও আসবে যাকে সে গালি দিয়েছে, কারু উপরে অপবাদ রটিয়েছে, কারু মাল-সম্পদ গ্রাস করেছে, কাকেও হত্যা করেছে, কাকেও প্রহার করেছে। তখন প্রত্যেক পাওনাদারকে তার নেকী সমূহ থেকে দিয়ে পাওনা পরিশোধ করা হবে। এইভাবে পাওনাদারদের দিতে দিতে যখন তার নেকীর ভাণ্ডার শেষ হয়ে যাবে, তখন ঐ লোকদের কৃত গোনাহসমূহ থেকে কেটে নিয়ে এই ব্যক্তির আমলনামায় যুক্ত করা হবে। অতঃপর তাঁকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[১]

গুরুত্বঃ

হাদীছটি সমাজে যুলুম ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে এবং মানবাধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা স্বরূপ। মানবাধিকার যেমন প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার এবং প্রত্যেক মানুষই তা অক্ষুণ্ন রাখতে চায়, ঠিক তার বিপরীতে অন্যের মানবাধিকার হরণ করা ও অন্যের উপরে যুলুম, শোষণ ও অত্যাচার করার মানসিকতাটাও মানুষের মজ্জাগত। আবার দ্বিমুখী এই চেতনাকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনের উন্নতি, অগ্রগতি ও কল্যাণের পথে পরিচালনার জন্য একটিই মাত্র চালিকাশক্তি রয়েছে। সেটি হ'ল আল্লাহভীতি। যার মধ্যে আল্লাহভীতি যত প্রবল, সে তত বেশী মানব কল্যাণকামী হবে। তার সকল তৎপরতা যুলুমের বিরুদ্ধে এবং মানবাধিকার রক্ষার পথে ব্যয় হবে। আল্লাহদ্রোহী বস্তুবাদী ব্যক্তি যদি কখনো মানবকল্যাণে কাজ করে, তবে সেটা হবে সাময়িক ও ঠুনকো। বস্তুগত স্বার্থের সংঘাতে যেকোন সময় সে লক্ষ্যচ্যুত হয়ে ছিটকে পড়বে। কারণ আখেরাতে তার কিছুই চাওয়া-পাওয়ার থাকে না। আর আখেরাতে কিছু চাওয়া-পাওয়ার না থাকলে অহেতুক মানুষ দুনিয়াবী স্বার্থ ত্যাগ করবে কেন? স্রেফ মানবতার কারণে? তাতে লাভ কি? বঞ্চিত মানুষের কাছে মানবতার দোহাই কতক্ষণ টিকবে? তাই কেবলমাত্র আল্লাহভীতি তথা আখেরাতে জবাবদিহীতার দায়িত্বানুভূতি, জান্নাতের ব্যাকুল আকাংখা ও জাহান্নামের তীব্র ভীতি মানুষকে পরস্পরের মানবাধিকার রক্ষা ও যুলুম প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। অত্র হাদীছটি সেদিকেই দিক-নির্দেশনা দান করেছে এবং সাথে সাথে সবকিছু থাকতেও কিছু না পাওয়ার বেদনায়, হতাশাগ্রস্ত ও প্রকৃত নিঃস্ব একজন পুণ্যবান ব্যক্তির ধূলি-মলিন চেহারা নাটকীয় বাণীচিত্রের মাধ্যমে অত্যন্ত ঋজুভাবে উপস্থাপন করেছে, যা পাঠক ও শ্রোতার চক্ষু-কর্ণ ডিঙিয়ে তার হৃদয়ের গভীরে রেখাপাত করে এবং আসন্ন মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের বাস্তব অবস্থা অবলোকন করে নিজেকে সাবধান হ'তে সহায়তা করে।

ব্যাখ্যাঃ

হাদীছটিতে مَا الْمُفْلِسُ বলা হয়েছে। যার অর্থ 'নিঃস্ব কি'? অথচ হওয়া উচিত ছিল مَنِ الْمُفْلِسُ 'নিঃস্ব কে'? এর জবাব এই যে, এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিঃস্ব ব্যক্তির চেয়ে তার নিঃস্বতাকেই মুখ্য হিসাবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। ভাষার এই সর্বোচ্চ অলংকার উম্মী নবীর জন্য শ্রেষ্ঠত্বের এক অনন্য দলীল। অবশ্য 'মাশারেকুল আনওয়ার' এবং 'মাছাবীহে'র কোন কোন সংস্করণে مَنِ الْمُفْلِسُ। কথাটিও এসেছে।

উক্ত হাদীছে একটি মৌলিক বিষয় ফুটে উঠেছে যে, মানবাধিকার রক্ষায় তথা বান্দার হক আদায়ের বিষয়ে কারু কোন শাফা'আত, সুফারিশ যেমন কাজে আসবে না, তেমনিভাবে হক নষ্টকারী যালেমকে কখনোই ক্ষমা করা হবে না। দুনিয়াতে সে যত বড় শক্তিশালী হৌক না কেন, আল্লাহ্র কঠিন বিচারের সম্মুখে সে নিতান্তই অসহায় ও নিঃস্ব। ইমাম নববী বলেন, দুনিয়াতে নিঃস্ব ও আখেরাতে নিঃস্ব এই দুই নিঃস্ব ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য এই যে, দুনিয়ার

১. মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৯০০ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'যুলুম' অনুচ্ছেদ নং ২১।

নিঃস্বতা সাময়িক। পরক্ষণেই তা দূর হয়ে যেতে পারে এবং সে স্বচ্ছল ও সম্পদশালী হয়ে যেতে পারে। অথবা তার নিঃস্বতার মেয়াদ হ'ল তার মৃত্যু পর্যন্ত। কিন্তু আখেরাতের নিঃস্ব ব্যক্তি হবে চিরস্থায়ী। তার ধ্বংস হ'ল চিরস্থায়ী ধ্বংস। যেখান থেকে মুক্তি ও পরিত্রাণ পাওয়ার কোন সুযোগ তার থাকবে না'।

মাযেরী বলেন, কোন কোন বিদ'আতী মনে করে যে, অত্র হাদীছটি কুরআনের বিরোধী। যেখানে বলা হয়েছে وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى 'একজনের পাপের বোঝা অন্যে বইবে না'।[২] তাদের এই দাবী বাতিল ও অজ্ঞতা প্রসূত। কেননা এখানে কেবল তার পাপেরই প্রতিফল দেওয়া হবে। আর সেই প্রতিফল দেওয়া হবে তার অর্জিত নেকী সমূহ থেকে। অতঃপর নেকী শূন্য হয়ে গেলে পাওনাদারের অর্থাৎ মযলূমের পাপ সমূহ থেকে কেটে এনে দেনাদার তথা যালেমের আমলনামায় যুক্ত করা হবে। নিজের কৃত যুলুমের শাস্তিস্বরূপ সে মযলূমের পাপ বহন করতে বাধ্য হবে। এটা স্রেফ হকদারের হক আদায়ের জন্য, একজনের পাপের বোঝা অন্যে বহনের উদ্দেশ্য নয়। আর এটাই হ'ল ইনছাফের দাবী।[৩]

অন্যতম কারণ এই যে, যালেম ব্যক্তি যদি মযলূমের দাবী পূরণ না করে স্রেফ অধিক পুণ্যের কারণে জান্নাতে চলে যায়, তাহ'লে তার দ্বারা নির্যাতিত মযলূমের হক বিনষ্ট হবে। কেননা আল্লাহ বলেন, وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ 'তাদের মধ্যে হক ফায়ছালা করা হবে এবং তারা মোটেও অত্যাচারিত হবে না' *(যুমার ৬৯)*। পক্ষান্তরে যালেম ব্যক্তি অধিক পুণ্যবান হওয়া সত্ত্বেও যদি জাহান্নামে যায়, সেটাও ন্যায় বিচারের পরিপন্থী হবে। কেননা আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ 'যার মীযানের পাল্লা ভারী হবে, সে ব্যক্তি (জান্নাতে) সুখী জীবন যাপন করবে' *(ক্বারে'আহ ৬-৭)*। অতএব ন্যায় ও ইনছাফের দাবী এটাই যে, পুণ্যবান যালেমের পুণ্যসমূহ মযলূমকে দেওয়া হউক, যাতে তার মীযানের পাল্লা হালকা হয়ে যায় এবং মযলূমের হকও আদায় হয়ে যায়। তাতেও না কুলালে মযলূমের পাপ থেকে এনে যালেমের আমলনামায় যুক্ত করা হউক, যাতে তার পাপের পাল্লা ভারী হয় এবং সেকারণে সে জাহান্নামে যায়। একারণেই ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যুলুম ক্বিয়ামতের দিন অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে'।[৪]

যুলুমের প্রতিকারঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَّ يَكُوْنَ لَهُ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ –

'যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের প্রতি যুলুম করেছে তার সম্মান কিংবা অন্য কোন বিষয়ে, সে যেন আজই তার নিকট থেকে তা মাফ করিয়ে নেয়, ঐদিন আসার পূর্বে (অর্থাৎ মৃত্যু বা ক্বিয়ামত আসার পূর্বে), যেদিন তার নিকটে দীনার ও দিরহাম (স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা) কিছুই থাকবে না। সেদিন যদি তার কোন নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুম পরিমাণ নেকী সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি নেকী না থাকে, তাহ'লে মযলূম ব্যক্তির গোনাহ তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হবে'।[৫]

মাফ করিয়ে নেওয়ার অর্থ হ'লঃ যদি কেউ অন্যায়ভাবে কোন কথা বা কাজের মাধ্যমে কারু মনে কষ্ট দিয়ে থাকেন বা সম্মান হানি করে থাকেন, তবে তিনি তার মনোকষ্ট দূর করবেন, তাকে সম্মান দিবেন ও ইতিপূর্বে কৃত অসম্মানের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষামা চাইবেন। যতক্ষণ তিনি অন্তর থেকে ক্ষমা না করবেন, ততক্ষণ তিনি ক্ষমাপ্রাপ্ত হবেন না বা গোনাহ থেকে মুক্ত হবেন না। যদি কেউ কারু উপরে আর্থিক বা বৈষয়িক যুলুম করে থাকেন, তবে তিনি হকদারকে তার হক বুঝে দিবেন এবং অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইবেন। যদি হকদার তাকে অন্তর থেকে ক্ষমা না করেন, তবে তিনি ক্ষমাপ্রাপ্ত হবেন না এবং আখেরাতে মুক্তি পাবেন না।

বিদায় হজ্জের সময় আরাফাতে ও মিনায় জীবনের সর্বশেষ ঐতিহাসিক ভাষণে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন,

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هَذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هَذَا،

'তোমাদের উপরে (চিরদিনের জন্য) হারাম করা হ'ল তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান। তোমাদের এ পবিত্র দিনের ন্যায়, এ পবিত্র শহরের ন্যায়, এই পবিত্র মাসের ন্যায়'।[৬]

---

২. আন'আম ১৬৪, ইসরা ১৫, ফাত্বির ১৮, যুমার ৭, নাজম ৩৮।
৩. মর্মার্থঃ মিরক্বাত ৯/৩২২।
৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১২৩; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৮৯৬।
৫. বুখারী, মিশকাত হা/৫১২৬; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৮৯৯।
৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৬৫৯ 'ইয়াওমুন নাহরের ভাষণ' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/২৫৪১; মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫ 'বিদায় হজ্জের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/২৪৪০।

মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম

অথচ আজকের পৃথিবীতে এ তিনটি হারাম বস্তুকেই হালাল করা হচ্ছে সর্বদা সর্বত্র। বিশেষ করে সমাজপতি, রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনেতাদের হাতে এ তিনটি বস্তু অধিক হারে লুণ্ঠিত হচ্ছে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে, পরোক্ষভাবে কিংবা স্পষ্ট প্রতারণার মাধ্যমে। সর্বত্র খুন-অপহরণ, যেনা-ব্যভিচার, সূদ-ঘুষ, চাঁদাবাজি, সশস্ত্র ক্যাডার পোষণ, মানি লোকের মানহানি ইত্যাকার অনৈতিক কাজ-কর্ম সমূহ চলছে এখন সমাজে অপ্রতিহত গতিতে। একইভাবে যারা 'মিডিয়া' জগতে আছেন, তাদের অধিকাংশ একে অপরের সম্মান বিনষ্টে লিপ্ত। বক্তাদের অধিকাংশের মুখে যেমন কোন বাঁধন নেই, লেখক, কলামিষ্ট ও সাংবাদিকদের অধিকাংশের কলমেও এখন আর তেমন বিবেকের বন্ধন লক্ষ্য করা যায় না। আলেম-জাহিল সবাই যেন একাকার হয়ে গেছে। অন্ধকার দূরীভূতকারী স্বচ্ছ জ্ঞানের অভাব সর্বত্র অতীব প্রকট আকার ধারণ করেছে। আখেরাতমুখী জ্ঞান ক্রমেই বিলুপ্তির পথে। সবকিছুই যেন আবর্তিত হচ্ছে দুনিয়াবী স্বার্থকে কেন্দ্র করে। দুনিয়ারূপী মৃত জানোয়ারের।[৭] উপরে আমরা হুমড়ি থেকে পড়ছি প্রতিনিয়ত, তাকে শকুনের মত ছিঁড়েছুটে খাওয়ার জন্য। অথচ তার পরিণাম নির্ঘাত ধ্বংস। পৃথিবী এখন সেই চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে চলেছে। সর্বত্র যালেমের জয়ধ্বনি। মযলূমের কান্না সর্বত্র গুমরে ফিরছে নীরবে নিভৃতে।

অতএব হে পুণ্যবান যালেম। মযলূমের বদদো'আ থেকে সাবধান হও! আখেরাতে নিঃস্ব হবার ভয় কর। হে মযলূম! শান্ত হও। আখেরাতে তোমার হক পূর্ণভাবে আদায় হবার অপেক্ষা কর।

নিঃসন্দেহে ক্বিয়ামতের দিন আমলের ওযনের কমবেশী হবে বান্দার ঈমান, ইখলাছ ও ইত্তেবায়ে সুন্নাহ্র উপরে ভিত্তি করে। শিরক, বিদ'আত ও রিয়া পূর্ণ আমল কখনোই নেক আমল নয়। যদিও বাহ্যিকভাবে তা দেখে লোকেরা প্রতারিত হয় ও সেদিকেই ধাবিত হয়। কুরআনের ভাষায় 'ঐ সব আমল হ'ল মরীচিকার ন্যায়' *(নূর ৩৯)*। পিপাসিত হৃদয় পানি ভেবে সেদিকে ছুটে যায় তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। কিন্তু সেখানে গিয়ে পানি না পেয়ে হতাশ হয়। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوْراً فَمَا لَهُ مِنْ نُوْرٍ، 'বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে (হেদায়াতের) আলো দান না করেন, তার জন্য (প্রকৃত অর্থে) কোন আলো নেই' *(নূর ৪০)*।

আল্লাহ আমাদেরকে ক্বিয়ামত যুগের ফিৎনা সমূহ হ'তে রক্ষা করুন এবং তাঁর প্রিয় বান্দারদের অন্তর্ভুক্ত করুন! -আমীন!!

৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৭; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৯৩০ 'রিক্বাক্ব বা মন গলানো' অধ্যায়।*

প্রবন্ধ

পর্দাহীনতার বিষময় ফল ও আধুনিকতা

*ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের**

নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসে ক্ষুদ্রতর পরিমণ্ডল তথা পরিবার থেকে শুরু করে এ বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বিশ্বব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মহান রাব্বুল আলামীন নারী-পুরুষের স্বতন্ত্র মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ককে স্থায়ী ভিত্তি প্রদানের লক্ষ্যে তাদের মাঝে সম্প্রীতি ও সদ্ভাবের এক সুস্থিত বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ-

'তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্য হ'তে অন্যতম নিদর্শন হ'ল, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হ'তে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের নিকট পরম প্রশান্তি লাভ করতে পার। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সুহৃদ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীলদের নিদর্শন জন্য রয়েছে' *(রূম ২১)*।

আর নারী-পুরুষ উভয়ে মিলেই এ পৃথিবীতে মানব সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً-

'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ হ'তে সৃষ্টি করেছেন, আর তা হ'তে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং এতদুভয় হ'তে অসংখ্য পুরুষ ও নারী পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন' *(নিসা ১)*।

নারী এবং পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ যেমন তাদের দৈহিক গঠনে বিদ্যমান অনুরূপভাবে পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা এবং প্রকৃতির বিচিত্র শোভা তাদের এই আকর্ষণকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়। তাই তাদের দৈহিক গঠন, আকৃতি-প্রকৃতি এবং শক্তি ও কর্মক্ষমতার তারতম্যের দিকটি বিবেচনা করে প্রাচীন কাল হ'তেই তাদের মাঝে

* *প্রফেসর, আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।*

পর্দাপ্রথা প্রচলন হয়ে আসছে। মূলতঃ নারীগণ তাদের আত্মমর্যাদার সংরক্ষণ, স্বাতন্ত্র্য রক্ষা এবং পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজেদের সম্মান-সম্ভ্রম রক্ষাকল্পে পর্দাপ্রথা মেনে চলত। এটি নারীদেরকে জবরদস্তিমূলক অবরুদ্ধ রাখার কোন প্রক্রিয়া নয় এবং পুরুষজাতি কর্তৃক তাদের উপর মানসিক নির্যাতন চালানোর কোন কর্মপন্থাও নয়। বরং এটি তাদেরকে স্ত্রী ও মাতৃত্বের সম্মানজনক অবস্থানে রাখার এক সর্বোত্তম পন্থা।

ইসলাম একটি সার্বজনীন তথা বিশ্বজনীন মানবপ্রকৃতির ধর্ম। ইসলাম সমাজে সুবৃত্তির ব্যাপক চর্চা এবং অসৎবৃত্তির মূলোৎপাটন করতে চায়। তাই ইসলাম কেবল অন্যায়, অপরাধ, অশ্লীলতা এবং ব্যভিচারকে হারাম ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং যেসব উপায়-উপকরণ ও উপলক্ষ এসব অসৎবৃত্তি সাধনে প্রলুব্ধ করে সেগুলিকেও হারাম বলে ঘোষণা করেছে। ইসলামে ব্যভিচার হারাম। তাই যেসব কাজ ব্যভিচারের পক্ষে সহায়ক তাও হারাম। যথা- কারো প্রতি অসৎ উদ্দেশ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা, কামভাব নিয়ে কাউকে স্পর্শ করা, কারো গোপন অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া ইত্যাদি। আর ব্যভিচার নামক এই নৈতিকতা বিরোধী সামাজিক অনাচার থেকে নারী-পুরুষকে রক্ষা করার জন্যই ইসলাম পর্দাপ্রথার প্রচলন করেছে।

সৃষ্টির প্রথম মানব আদম (আঃ) হ'তে শুরু করে মহানবী (ছাঃ)-এর যুগ পর্যন্ত সময়কালে কোন ধর্ম কিংবা কোন সভ্যতা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে কখনো বিধান হিসাবে মেনে নেয়নি এবং তা সমর্থনও করেনি। প্রাচীন যুগে পাক-ভারত উপমহাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য সম্প্রদায় নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার পক্ষপাতী ছিলনা। আরবের অভিজাত শ্রেণীর মহিলাগণ নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য আবৃত করে বাইরে যেত। পবিত্র কুরআনে পর্দার বিধান সম্বলিত আয়াত নাযিল হয়েছে তৃতীয় হিজরী হ'তে পঞ্চম হিজরী সালের মধ্যে। এতে নারী-পুরুষ উভয়কে দৃষ্টি অবনমিত রাখা, লজ্জাস্থান হেফাযত করা, নারীদের সতর ঢেকে চলা, আপাদমস্তক ঢেকে চলা, গায়রে মাহরাম পুরুষদের থেকে পর্দা করা ইত্যাদির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই মহিলাদের কর্মক্ষেত্র হ'ল তাদের গৃহের অভ্যন্তর। এজন্য মহান আল্লাহ তাদেরকে গৃহে অবস্থানের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى،

'তোমরা তোমাদের ঘরের অভ্যন্তরে অবস্থান কর আর পূর্ববর্তী জাহেলিয়াতের ন্যায় নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য ও দেহ প্রদর্শন করে বেড়িও না' *(আহযাব ৩৩)*। আল্লামা আলূসী তার তাফসীর 'রূহুল মা'আনী' গ্রন্থে اَلتَّبَرُّجُ শব্দের অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, أَنْ تَبْدِىَ مِنْ مَحَاسِنِهَا مَايَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُهُ 'যেরূপ সৌন্দর্য ঢেকে রাখা কর্তব্য তা প্রকাশ করার নামই হ'ল التبرج। যা জাহেলিয়াতের অন্তর্গত' *(তাফসীর রূহুল মা'আনী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।

কেবল নারীর অঙ্গ-সৌষ্ঠব, দৈহিক সৌন্দর্য এবং রূপ লাবণ্যই নয়; বরং যেসব বিষয় নারীদেরকে পুরুষদের নিকট মোহনীয় ও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে, সেসব বিষয় পরিহারের ক্ষেত্রেও পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ সমূহে সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। যথা- নারীদের অলংকারের ঝনঝনানি, সুললিত কণ্ঠস্বর এবং সুগন্ধি ব্যবহার। নারীগণ এমন কোন অলংকার ব্যবহার করবে না, যা চলার সময় আওয়ায করে পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَلاَيَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ– 'নারীগণ যেন এমন পদক্ষেপে না চলে যাতে পুরুষদের নিকট তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে' *(নূর ৩১)*।

নারীদের কোমল কণ্ঠস্বর অনেক সময় পুরুষদেরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে। এতে ফিৎনার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। যদি কখনো নারীদেরকে একান্ত বাধ্য হয়ে পুরুষদের সাথে কথা বলতেই হয় তবে তারা কর্কশ স্বরে কথা বলবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَتَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا–

'হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্যান্য নারীদের মত নও। যদি তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করতে চাও তাহ'লে তোমরা কোমল ও মোলায়েম স্বরে কথা বলো না, পশ্চাতে কুটিল চিত্তের লোকজন তোমাদের সম্পর্কে অন্য কিছু আশা করে বসবে। আর তোমরা সঙ্গত কথা বল' *(আহযাব ৩২)*। আলোচ্য আয়াতে নারীদেরকে তাক্বওয়া অবলম্বন এবং পর্দার অন্তরাল হ'তে পরপুরুষের সাথে কর্কশ স্বরে কথোপকথনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। তবে কোনক্রমেই শয়তানী প্ররোচনাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। আর একান্ত বাধ্য হ'লে পুরুষদেরকেও পর্দার অন্তরাল হ'তে কথা বলার অনুমতি প্রদান করে মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ،

'যখন তোমরা তাদের নিকটে কিছু চাইবে তবে পর্দার অন্তরাল থেকেই চাইবে। এটি তোমাদের ও তাদের দিলের পবিত্রতা রক্ষার উত্তম পন্থা' *(আহযাব ৪৩)*।

নারীগণ প্রয়োজনে শারঈ পর্দা অনুসরণ করে ঘরের বাইরে যেতে পারবে। এটি শরী'আত কর্তৃক অনুমোদিত। মহানবী (ছাঃ) উম্মুল মুমিনীন সাওদা (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, قَدْ أَذِنَ اللّٰهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ– 'মহান আল্লাহ তোমাদেরকে প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন' *(বুখারী, মুসলিম)* তবে তা উচ্ছৃঙ্খল সাজসজ্জা কিংবা চিত্তহরণকারী প্রসাধনী ব্যবহার করে নয়। মহানবী (ছাঃ) বলেন, أَيُّمَا إِمْرَأَةٍ إِسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوْا رِيْحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ– 'কোন মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে কোন জন সমাগমের পাশ দিয়ে চলে যায়, আর তার উদ্দেশ্য থাকে লোকজন তার সুগন্ধি দ্বারা বিমোহিত হবে, সে হ'ল একজন ব্যভিচারিণী'।[১] কারণ সুগন্ধি ব্যবহার পুরুষদেরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, মহানবী (ছাঃ) বলেন, إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ– 'যখন কোন মহিলা ঘর হ'তে বের হয়, শয়তান তখন তার দিকে উঁকি মেরে তাকিয়ে থাকে'।[২]

ইসলাম যে পর্দাপ্রথার প্রচলন করেছে, তাতে অতিমাত্রিক বাড়াবাড়ি নেই; বরং এতে সমতা, নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য, তাদের দৈহিক ও শারীরিক অবস্থা এবং স্বভাবজাত শক্তির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। নারী-পুরুষের পারস্পরিক সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ার লক্ষ্যেই পর্দা প্রথার নির্দেশ। পর্দার মাধ্যমে একদিকে যেমন নারীর আভিজাত্য রক্ষা হয়, অপরদিকে দুষ্ট-লম্পট শ্রেণীর লোকেরা পর্দানশীলা মহিলাদেরকে নির্লজ্জ-বেহায়া মনে করে উত্তক্ত করার সুযোগ পায় না। নারীর অঙ্গ-সৌষ্ঠব, দেহাবয়ব ও রূপ-সৌন্দর্য পুরুষের প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে থাকে। আর তা দমনের একমাত্র পথ হ'ল নারীর সৌন্দর্যকে আবৃত রাখা, যা কেবল পর্দাপ্রথা অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব। সৌন্দর্য ও রূপমাধুর্য উন্মুক্ত রেখে প্রবৃত্তিকে দমন করা অসম্ভব, যেমন অসম্ভব উনুনের উত্তপ্ত আগুনে পানি দিয়ে তা ঠাণ্ডা রাখার প্রয়াস চালানো। এজন্য মহান রাব্বুল আলামীন নারী-পুরুষ উভয়কে পর্দাপ্রথা অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ط إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ– وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ–

'হে নবী! আপনি মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী করে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। এটি তাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতা লাভের পথ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞাত। আর আপনি মুমিন নারীদেরকেও বলে দিন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী করে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। আর তারা যেন তাদের অঙ্গ-সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, যেটুকু আপনা-আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে সেটুকু ব্যতীত। আর তারা যেন তাদের ওড়নাগুলিকে বুকের উপর ভাল করে টেনে নেয়' *(নূর ৩০-৩১)*।

আল-কুরআনের উক্ত আয়াতদ্বয়ে নারী ও পুরুষের জন্য পর্দার সীমারেখা নির্দেশ করা হয়েছে। অপরদিকে এতে নারীদের জন্য উচ্ছৃংখল সাজসজ্জার প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা পুরুষদেরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করার অন্যতম হাতিয়ার। অন্য আয়াতেও নানা প্রকার প্রসাধনী ব্যবহার করে কৃত্রিম সৌন্দর্য সৃষ্টির অপপ্রয়াসকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে *(আহযাব ৩৩)*। বর্তমান আধুনিক বিশ্বে সকল প্রকার প্রসাধনী যেন নারীদের জন্যই তৈরী করা হয়েছে আর তা ব্যবহারের মাধ্যমে সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য শরীর অনাবৃত করার প্রতিযোগিতায় লেগে যায় এবং নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গিমার মাধ্যমে এর প্রকাশ ঘটায় যা জাহেলিয়াতের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ।

নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্রের মাঝে সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পর্দাপ্রথার সাফল্য অনস্বীকার্য। স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্রে তাদের যথাযথ সাফল্যের জন্য পর্দাপ্রথার প্রয়োজন অত্যধিক। পুরুষের কর্তৃত্ব প্রবণতা নারীত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক। আর পর্দাপ্রথা বিসর্জন দিয়ে নারী জাতির পুরুষদের কাতারে এসে দাঁড়ানোও অসম্মানজনক। পুরুষের সামাজিক ও প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে নারীরা নিয়োজিত হ'লে পুরুষদের সাথে তাদের অবাধ মেলামেশার সুযোগে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে আড্ডায় মেতে উঠার কারণে অনেক কর্মঘন্টা নষ্ট হবে যা জাতীয় উন্নতি-অগ্রগতির পথে বিরাট অন্তরায়। অপরদিকে উচ্ছৃংখল যৌনাচার সমাজদেহকে কলুষিত এবং পংকিলতাপূর্ণ করে তোলারও সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। এতে কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ব্যর্থতার চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে উঠার সম্ভাবনাই বেশী। পক্ষান্তরে নারীর মর্যাদা সংরক্ষণ এবং উপযোগী স্থানে তার সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশই হ'ল পর্দার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। পর্দাহীনতা নারী জাতিকে এক অসম প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ করে, যা ধীরে ধীরে মানব সমাজের অন্তর্দেশে ব্যাপক বিশৃংখলা সৃষ্টি করে।

বর্তমান যুগ নারী স্বাধীনতা ও নারী প্রগতির যুগ। বর্তমানে নারীগণ গৃহস্থালী হ'তে শুরু করে অফিস-আদালত পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে পেশাগত উন্নতির দাবী করছে। কিন্তু তাদের কর্মক্ষমতা, কর্মদক্ষতা এবং কাজের প্রকৃতিগত দিক দিয়ে গুণগত ব্যাপক কোন পরিবর্তন সূচিত হয়েছে বলে মনে হয় না। বরং আধুনিকতা, নারী স্বাধীনতা, নারী জাগরণ,

১. *আহমাদ ৪/৪১৮পৃঃ; ছহীহুল জামে' হা/২৭০১।*
২. *তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১০৯।*

নারী মুক্তি আন্দোলন এবং প্রগতির চটকদার শ্লোগান নিয়ে নারীদেরকে তাদের যথোপযুক্ত কর্মক্ষেত্র তথা গৃহের অভ্যন্তর হ'তে বের করে নিয়ে আসে আধুনিক ইউরোপ। এরই মাধ্যমে সৃষ্টি হয় নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও অবৈধ যৌন সম্পর্কের সুযোগ। ফলে মানব সভ্যতা আজ বিপর্যস্ত এবং মানবজাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আজ পর্যুদস্ত ও চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

বর্তমানে আধুনিক চিন্তাধারায় বেড়ে উঠা নারীগণ গৃহের অভ্যন্তরে শৃংখলিত জীবন-যাপনে সম্মত নয়। এখন তারা পুরুষের পাশাপাশি ময়দানের সকল ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করতে চায়। ইউরোপ এবং পাশ্চাত্য সমাজের নারীরা বর্তমানে গৃহের তুলনায় হোটেল, রেস্তোরাঁ, সেক্স ক্লাব, নাইট ক্লাব, পার্ক এবং বারে বয়ফ্রেন্ডদের সাথে আমোদ-ফুর্তি করে সময় কাটানোকে অধিক পসন্দ করে। প্রাচ্যের দেশ সমূহেও এর হাওয়া লাগতে শুরু করেছে। অর্থোপার্জনেও নারীগণ পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সভা-সমিতি, ক্লাব, নাট্যমঞ্চ প্রভৃতির প্রতি এদের আকর্ষণ বেশী। তাদের এই বহির্মুখী জীবনধারা হাযার বছরের ঐতিহ্যে লালিত পরিবার কেন্দ্রিক জীবন ধারার প্রথাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে পারিবারিক বিপর্যয় ও সামাজিক বিশৃংখলা। তারা আজ নিজেদেরকে বিজ্ঞাপনের মডেলে পরিণত করেছে, অপসংস্কৃতির সয়লাবে গা ভাসিয়ে দিয়ে সুখ অন্বেষণ করছে। পুরুষের কামসহচরী হয়ে তারা জীবনকে চরমভাবে উপভোগ করছে। আর তাদের সন্তান-সন্ততিরা মাতৃক্রোড়ে মাতৃস্নেহে লালিত-পালিত হওয়ার পরিবর্তে নিতান্ত অযত্ন-অবহেলায় শিশুসদন কিংবা গৃহভৃত্যের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হচ্ছে, যেখানে মাতৃস্নেহ, আদর-যত্ন এবং মায়া-মমতা অনুপস্থিত।

পর্দাপ্রথা বিসর্জন দিয়ে আধুনিক নারী সমাজ আজ তাদের পোশাক-আশাকের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কমাতে কমাতে লজ্জাহীনতার চরম পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। ইউরোপ ও আমেরিকান সমাজের প্রভাবে প্রাচ্যের অনেক দেশে আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নারী-পুরুষের জন্য নগ্ন ও উলঙ্গ ক্লাব, বার ইত্যাদি। স্বাধীনভাবে অন্নসংস্থান ও রুটি-রোযগারের দাবী নিয়ে নারী স্বাধীনতা ও নারীমুক্তি আন্দোলনের ধ্বজাধারীরা নারীদেরকে কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের পাশে দাঁড় করিয়ে স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জনে প্রলুব্ধ করে ঘরের বাইরে নিয়ে আসে। এভাবে চাকরি ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পর যেহেতু তারা আর স্বামীর উপর নির্ভরশীল নয়, তাই তারা এক স্বামীর উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না। ফলে ভেঙ্গে পড়ছে পরিবার প্রথা, ধ্বংস হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কের সুস্থিত-মযবূত বুনিয়াদ, বেড়ে চলছে সামাজিক অপরাধ, বিবাহ বিচ্ছেদ কিংবা লিভ টুগেদার নামক অনৈতিকতার সয়লাব, খুন, হত্যা, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি। এভাবে নারীরা তাদের সতিত্ব, পবিত্রতা, নৈতিকতা এবং ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে পশুত্বের চরম পর্যায়ে নেমে আসে, সংসার জীবন থেকে শান্তি-শৃংখলা, ভালবাসা-মমত্ববোধ তিরোহিত হয় আর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সৃষ্টি হয় সংশয়-সন্দেহের সীমাহীন জাল। অবিশ্বাস আর অসহযোগিতা যেন তাদের নিত্যসঙ্গী। এভাবে পর্দাহীনতার কুফলে সৃষ্ট আধুনিকতা সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং পারিবারিক জীবনে নারীর আধিপত্য ক্ষুণ্ন করে। ফলে নারীরা ভোগের বস্তুতে, বিজ্ঞাপনের মডেলে এবং বিপনণের অন্যতম হাতিয়ারে পরিণত হয়। ফলে পুরুষরাও আর নারীদের দায়-দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহী হয় না।

এবার আমরা পর্দাহীনতার দেশ, নারী স্বাধীনতার দেশ এবং চরম আধুনিকতার দাবীদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নারী সমাজের অপরাধ প্রবণতার কিছু চিত্র তুলে ধরতে চাই। এফ,বি,আই কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী বিগত ১০ বছরের ব্যবধানে সে দেশে মহিলা অপরাধীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় ১৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অপরাধে ৪৮,৪৩৩ জন মহিলা গ্রেফতার হয়। আর ২০০২ সালে এসে সেখানে গ্রেফতার হওয়া মহিলার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯,২৭,৫১৩ জনে।[৩] তাছাড়া সেখানে অবৈধ যৌনাচার এতই বেশী যে, প্রতি হাযার নবজাতকের মধ্যে অবৈধ সন্তান জন্ম লাভ করে শতাধিক। প্রতি বছর কুমারী মেয়েরা চার লক্ষাধিক জীবিত সন্তান প্রসব করে। কলেজে পড়া অবস্থায়ই ছাত্ররা বহু সংখ্যক বারাঙ্গনার সংসর্গ লাভ করে মার্কিন মুল্লুকে। আর অবাধ যৌনাচারের কারণে বিশ্বব্যাপী এইড্স জাতীয় জীবন সংহারক যৌনরোগের সম্প্রসারণ নিঃসন্দেহে পর্দাহীনতা তথা আধুনিকতার নগ্ন চেহারাকে উন্মোচিত করে তোলে। কেবল আমেরিকা নয়, ফ্রান্সসহ পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের অবস্থাও প্রায় একই। ফলে মানব সমাজ ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি মানবতা বিধ্বংসী পর্যায়ে নেমে এসেছে। আধুনিকতা, নারী স্বাধীনতা, প্রগতি এবং নারী মুক্তি আন্দোলনের নামে নারী জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নতি যতটুকু হয়েছে তার তুলনায় ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধের বিপর্যয়ই হয়েছে বেশী।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, নারী স্বাধীনতা নামক বস্তুবাদী ও ভোগবাদী আধুনিক ভাবধারা নারীত্বের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে, আর তাদের গার্হস্থ্য জীবনকে করেছে সন্দেহ-সংশয়ে পরিপূর্ণ। ফলে তারা তাদের প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদার আসন হ'তে ছিটকে পড়েছে। এ অবস্থা হ'তে নারীদেরকে রক্ষা করতে হ'লে ইসলাম নির্দেশিত পর্দাপ্রথা অনুসরণের কোন বিকল্প নেই।

৩. *দৈনিক সংগ্রাম, ৫ জানুয়ারী ২০০৪, পৃঃ ৩।*

ভারতের চানক্য নীতি ও আজকের বাংলাদেশ

*ডাঃ ফারুক বিন আবদুল্লাহ**

প্রাচীন ভারতের মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (খ্রীষ্ট পূর্ব ৩২৪-৩০০) মন্ত্রী ও প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক উপদেষ্টা চানক্য, যিনি 'কৌটিল্য' নামেও পরিচিত, তিনি অর্থশাস্ত্র (Science of politics) নামে একটি বই লিখেছিলেন। ভারতীয় শাসক ও রাজনীতিবিদরা আজও তাদের কূটনীতি ও গুপ্তচরবৃত্তির ক্ষেত্রে চানক্যকে অনুসরণ করে থাকেন। গুপ্তচরবৃত্তিতে পারদর্শী এবং প্রতারক চানক্য রাজনীতি ও কূটনীতি সম্পর্কে ছয়টি তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন। তত্ত্বগুলি হ'ল-

১. 'সাম' (সন্ধি ও বন্ধুত্ব) অর্থাৎ অন্য রাষ্ট্রের সাথে চুক্তির মাধ্যমে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে।

২. 'দান' (অর্থদান, সাহায্যদান) অর্থাৎ অন্যকে নিজের কাছে আশ্রয় ও নিরাপত্তা চাইতে বাধ্য করাই হচ্ছে মিত্রতা।

৩. 'ভেদ' (শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রে বিভেদের সৃষ্টি করা) অর্থাৎ সকল সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রকে শত্রু মনে করতে হবে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাদে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করতে হবে।

৪. 'দন্ড' (আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ বা শাস্তি প্রদান) অর্থাৎ অনবরত আঘাত করে শত্রুকে আহত করতে হবে এবং তার নামই হচ্ছে যুদ্ধ।

৫. সামরিক তৎপরতা চালনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং শক্তিশালী মাত্রই যুদ্ধ করবে।

৬. ক্ষমতা অর্জনের লোভ এবং অন্য দেশ বিজয়ের আকাংখা মন থেকে মুছে যেতে দেওয়া যাবে না।

চানক্যের মতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্থায়ী শান্তি অবাস্তব। কারণ শক্তিশালী মাত্রই যুদ্ধ করবে। শুধুমাত্র শক্তিই যেকোন দু'টি দেশ বা দুই রাজার মধ্যে শান্তি বজায় রাখতে পারে। যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা করার ক্ষমতাকেই চানক্য রাজগুণাবলীর মধ্যে অন্যতম গুণ বলে চিহ্নিত করেছেন।

ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতীয় রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য থেকে শুরু করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী পর্যন্ত প্রত্যেক ভারতীয় শাসক চান্যকের উপরোক্ত সূত্রগুলি অনুসরণ করে এসেছেন। তবে এ ব্যাপারে বিশেষ করে ভারতীয় কংগ্রেসের জওহর লাল নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, নরসীমা রাও প্রমুখ নেতানেত্রীকে An Expert Headmaster হিসাবে বিবেচনা করা চলে।

নিঃসন্দেহে জওহরলাল নেহেরু একজন দেশপ্রেমিক ও প্রাজ্ঞ রাজনীতিক ছিলেন, যার যোগ্যতা সম্পর্কে কারো দ্বিমত থাকতে পারে না। 'The Discovery of India' এবং 'Glimpses of World History' এ দু'টি বই পড়লেই নেহেরুর পাণ্ডিত্য ও তার জ্ঞানের গভীরতা সহজে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু নিজের দেশকে শক্তিশালী ও উন্নত করার জন্য তিনি যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করেছিলেন, তা ছিল স্পষ্টভাবেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির স্বার্থের প্রতিকূলে। তার বিরোধী পক্ষ ছাড়াও তার রাজনৈতিক সহযোদ্ধা কংগ্রেসের সভাপতি ও স্বাধীন ভারতের আজীবন শিক্ষামন্ত্রী মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তার বিখ্যাত বই 'India wins Freedom' গ্রন্থেও নেহেরুর এরূপ মনোবৃত্তির কথা প্রকাশ করেছেন।

১৯৪৫ সালে সবেমাত্র আজকের স্বঘোষিত বিশ্বমোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হয়েছে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, চীন তো দূরের কথা, পরাশক্তি রাশিয়া পর্যন্ত এ্যাটম বোমা তৈরী করতে সক্ষম হয়নি। এমতাবস্থায় কেউ কি কখনো কল্পনা করেছে, ভারতের মত দরিদ্র ও পরাধীন দেশ পারমাণবিক বোমা তৈরী করবে? কারণ তখনও নিশ্চিত ছিল না যে, ভারত কবে নাগাদ স্বাধীন হবে এবং হ'লেও কখন হবে? কিন্তু একথা আজ ভাবতে সত্যিই আশ্চর্য লাগে যে, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেহেরু সেদিন 'Nuclear India'র স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং ভারতে পারমাণবিক অস্ত্র মওজূদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৬ সালের ২৬শে জুন এক জনসভায় তিনি বলেছিলেন, 'যতদিন পৃথিবী এখানকার মত পরিচালিত হবে, ততদিন পর্যন্ত প্রতিটি দেশের একটি যথার্থ উপকরণ থাকবে এবং সে তার নিরাপত্তার খাতিরে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নয়ন সাধন করবে এবং আমি আশা করি ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা পারমাণবিক শক্তিকে গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করবেন। কিন্তু ভারত যদি আক্রান্ত হয়, তবে অবশ্যই তার ভাণ্ডারে যা কিছু মওজূদ আছে, তা নিয়ে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে। আমি আশা রাখি যে, সাধারণত ভারত অন্যান্য দেশের সাথে মিলিতভাবে পারমাণবিক বোমার ব্যবহারে বিরোধিতা করবে'।

পাঠক! এবার দেখা যাক, ভারত কিভাবে প্রাচীন ভারতীয় কূটনীতিক চানক্যের ছয়টি সূত্র অনুসরণ করে আসছে। প্রথম সূত্রে বলা হয়েছে, অন্য রাষ্ট্রের সাথে চুক্তির মাধ্যমে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে। আজকের আধুনিক পারমাণবিক শক্তির অধিকারী অহিংস ভারত তার সীমান্ত ও পার্শ্ববর্তী প্রতিটি রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করেছে। এসব চুক্তিকে তারা আখ্যায়িত করেছে 'মৈত্রী ও সহযোগিতা' চুক্তি নামে। যদিও এসব অধিকাংশ চুক্তিই সীমান্তবর্তী প্রতিটি দেশের জন্য তেমন কল্যাণকর ফল বয়ে আনেনি। এসব চুক্তি করা হয়েছে কূটনৈতিক ছলনার মাধ্যমে। পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পাদিত চুক্তি হ'তে উল্লেখযোগ্য কিছু পাঠকের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরা হ'ল-

* গ্রামঃ চিনীর পটল, পোঃ সাথাটা, গাইবান্ধা।

১. সিকিমের সাথে একটি কথিত চুক্তি নিয়ে ২০ মার্চ ১৯৫০ সালে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেসনোটে উল্লেখ করা হয়, 'এখন থেকে সিকিমে একজন ভারতীয় কর্মকর্তা দেওয়ান হিসাবে রাজ্যের কার্যাদি পরিচালনা করবেন'।

উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭-এর পর থেকেই ভারত সিকিমে কয়েকটি পোষ্য রাজনৈতিক দল পুষে আসছিল। ভারতের আশির্বাদপুষ্ট এসব রাজনৈতিক দলগুলি তাদের প্রভুর নির্দেশে সিকিমের অভ্যন্তরে সর্বত্র বিশৃংখলা, মারামারি, রাজনৈতিক হানাহানি, বোমা বিস্ফোরণ, ধর্মঘটসহ আইন শৃংখলা পরিস্থিতির এতই দ্রুত অবনতি ঘটায় যে, সে দেশের ধর্মরাজা চেগিয়ালের পক্ষে দেশ শাসন করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর মন্ত্রীসভার গোপন পরামর্শে তথাকথিত গণতন্ত্রের নামে দেশে নির্বাচন দিয়ে শাসন ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি নেন। ভারতের পোষ্য রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচিত সেই সরকার প্রধান কাযী লেন্দুপ দর্জি ১৯৭৫ সালের ১০ এপ্রিল সিকিম জাতীয় পরিষদে এক প্রস্তাব পাশ করে চেগিয়ালের (রাজা) পদ বিলোপ করে এবং ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে মিশে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। ভারত কালবিলম্ব না করে ১৯৭৫ সালের ২৬ এপ্রিল ভারতীয় সংবিধানের ৩৮তম সংশোধনী পাশ করে ভারত স্বাধীন সার্বভৌম সিকিম রাজ্যকে তার ২২তম প্রদেশ হিসাবে ঘোষণা করে।

১৯৪৭ সালের ১৬ জুলাই ইংল্যান্ডে ভারত বিষয়ক সচিব লর্ড লিস্টোয়েল (Lord listowel) বলেন, 'এখন থেকে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি প্রত্যাহার এবং তাদের দাপ্তরিক কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করা হ'ল। .... দেশীয় রাজ্যগুলি, ভারত, পাকিস্তান ডোমিনিয়নের কোনটিতে যোগ দেবে অথবা একক স্বাধীন সত্তা বজায় রাখবে তা সম্পূর্ণ তাদের ইচ্ছাধীন। ব্রিটিশ সরকার এ বিষয়ে কোন রকম প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করবে না'। অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে প্রণীত ভারত স্বাধীনতা আইনে বলা হয়, দেশীয় রাজ্যগুলির উপর বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ অবসানের পর রাজ্যগুলি স্বীয় ইচ্ছামত ভারত অথবা পাকিস্তান ডোমিনিয়নে যোগ দিতে পারবে অথবা স্বাধীন থাকতে পারবে।

১৯৪৭ সালের ভারত অধীনতা আইনের এই নীতি যৌক্তিক এবং বাস্তবসম্মত হ'লেও কংগ্রেস এবং স্বয়ং মাউন্ট ব্যাটেনের ষড়যন্ত্রে এই নীতি কার্যকর হ'তে পারেনি। কংগ্রেস বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতভুক্ত করার জন্য মরিয়া হয়ে চানক্য নীতি প্রয়োগ করেন। তারা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে দেশীয় রাজ্যগুলি গ্রাস করার জন্য একটি বিশেষ বিভাগ চালু করেন, যার প্রধান ছিলেন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল এবং সেক্রেটারী ছিলেন ভি,পি,কৃষ্ণ মেনন। ভারত বিভাগের অন্যতম খলনায়ক মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ২৫ জুলাই দেশীয় রাজাদের এক বৈঠকে ভারত ডোমিনিয়নে যোগদানের আহ্বান জানান এবং তাদেরকে প্রস্তাব প্রদান করেন। কংগ্রেস এবং মাউন্টব্যাটেন চক্রের দ্বিমুখী ষড়যন্ত্রে দেশীয় রাজ্যগুলি এক এক করে ভারতের সাথে মিশে যায়। উল্লেখ্য যে, হায়দারাবাদ, জুনাগড় ও কাশ্মীর এই তিনটি দেশীয় রাজ্য ছাড়া সকল রাজ্যই ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট 'ভারতভুক্তি দলীলে' স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। ১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট স্বাধীন পাকিস্তান ঘোষণা করা হ'লে সে রাষ্ট্রের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হন কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ এবং ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হ'লে সে রাষ্ট্রের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হন পরাধীন ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন। ভারতীয় কংগ্রেসের দালালী করার পুরস্কার হিসাবে লর্ড ম্যাউন্টব্যাটেনকে সদ্য নবজাতক রাষ্ট্রপ্রধান গভর্ণর জেনারেল করা হয়।

উল্লেখ্য যে, দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে হায়দারাবাদ ছিল সবচেয়ে বড়, প্রায় ফ্রান্সের আয়তন বিশিষ্ট। ২৬ হাযার বর্গমাইলের এই রাজ্যটি ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা ঘোষণা করে। শুধু বিশাল আয়তনের দিক থেকে নয়, সম্পদ, সমৃদ্ধি, সামর্থ্যের দিক থেকেও একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে টিকে থাকার সব সম্ভাবনাই ছিল হায়দারাবাদের। তার ছিল নিজস্ব গণতান্ত্রিক সরকার, ছিল নিজস্ব সংবিধান, ছিল নিজস্ব পতাকা, জাতীয় সংগীত, দেশে ছিল নিজস্ব রাষ্ট্রদূত। ছিল হাইকোর্ট, ছিল নিজস্ব ভাষা এবং নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়। আরো ছিল জাতিসংঘে নিজস্ব প্রতিনিধি।

চানক্য নীতির অনুসারী পণ্ডিত নেহেরুর একটি বক্তব্য হচ্ছে, 'যদি এবং যখন প্রয়োজন মনে করব, হায়দারাবাদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান শুরু করা হবে'। আধুনিক চানক্য পণ্ডিত বলে পরিচিত নেহেরুর এই দাম্ভিক উক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ১৯৪৮ সালের ৩০ জুলাই ব্রিটিশ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্যার লিওনার্ড স্পেনসার উইলিয়াম চার্চিল কমন্স সভায় বলেছিলেন, 'নেহেরুর ভীতি প্রদর্শনের ভাষা অনেকটা হিটলারের ভাষার অনুরূপ যা তিনি অষ্ট্রিয়া ধ্বংস করার সময় ব্যবহার করেছিলেন' (V.K. Bawa, The last Nizam)। অতঃপর ধূর্ত নেহেরু-প্যাটেল চক্র সকল আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতি, বিশ্বজনমত, শুভচিন্তা, সততা উপেক্ষা করে (হাল আমলে বুশ, ব্লেয়ার চক্র যেমন ইরাক-আফগানিস্তানে পশুশক্তি দিয়ে ভূমি দখল করেছে) হায়দারাবাদের স্বাধীনতার মাত্র ১ বৎসর ৩ মাস পর ১৯৪৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী নামিয়ে সে দেশ দখল করে নেয়। ভারত তার ক্ষাত্রশক্তি বলে 'অপারেশন পোলো'র (Operation Pollo) মাধ্যমে ১৯৪৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর মাত্র ৫ দিনের অসম এক যুদ্ধে জোর করে হায়দারাবাদের পতন ঘটায়। আগ্রাসী ভারতীয় পশুশক্তির কাছে লক্ষাধিক দেশপ্রেমিক শাহাদৎ বরণ করেন। প্রধানমন্ত্রী মীর লায়েক আলী এবং 'ইত্তেহাদুল মুসলেমীনে'র আমীর কাসিম রিজভীর মত দেশপ্রেমিক নেতা হায়দারাবাদের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে পারেননি, ভারতীয় পোষ্য এবং অনুগ্রহপ্রার্থী বিশ্বাসঘাতক জেনারেল সাঈদ আহমাদ আল-ইদরুস, আবুল হাসান সৈয়দ নবাব

দীন ইয়ার জং প্রমুখ ভারতপন্থীদের কারণে।

ভারতীয় উপমহাদেশে হায়দারাবাদ যে একদিন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল, সেকথা আজকের নতুন বংশধররা জানে কি? দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই আজ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে আধিপত্যবাদী ভারতীয় বাহিনীর অপকর্মকে প্রকাশ করা। এখানে একটা কথা জানানো দরকার যে, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরে রিজার্ভ ব্যাংকের অংশ হিসাবে পাকিস্তানের প্রাপ্য ছিল ৫০ কোটি টাকা। সদ্যজাত পাকিস্তান রাষ্ট্র নিদারুণ অর্থকষ্টে পতিত হয় ভারতীয় নেতাদের মুসলিম বিদ্বেষের কারণে। কারণ পাকিস্তানের প্রাপ্য ৫০ কোটি টাকা ভারত দিতে অস্বীকার করে। অর্থকষ্টে পড়ে পাকিস্তান তখন অস্তিত্ব হারাতে বসেছিল। পাকিস্তানের সেই দুঃসময়ে হায়দারাবাদের ৭ম নিযাম মীর ওছমান আলী খান পাকিস্তানকে ২০ কোটি টাকা ঋণ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। পাকিস্তানকে ঋণদানের ঘটনাটিকে ভারত চুক্তি খেলাপের অজুহাত হিসাবে খাড়া করে হায়দারাবাদের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করে তার অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেবার প্রয়াস চালিয়েছিল।

২। পৃথিবীর একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র হচ্ছে নেপাল। নেপালের সাথে ভারতের মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৫০ সালে। চুক্তির শর্তানুসারে নেপাল ভারত ছাড়া তৃতীয় কোন দেশ থেকে সমরাস্ত্র কিনতে পারবে না।

১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে নেপাল চীন থেকে অল্প কিছু বিমান বিধ্বংসী অস্ত্র সংগ্রহের উদ্যোগ নিলে ভারত স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র নেপালের সাথে তার সবকটি ট্রানজিট রুট বন্ধ করে দেয়। নেপালের মোট ১৫টি ট্রানজিট রুট বন্ধ হয়ে গেলে নেপাল বাধ্য হয় ভারতের কাছে মাথা নোয়াতে। এভাবে নেপালকে বাধ্য করে মিত্রতা সৃষ্টি করা চানক্য নীতির একটা উদাহরণ নয় কি?

৩। যে শর্তে ভারতীয় কংগ্রেস ভারত বিভক্তিতে রাযী হয়েছিল, সে শর্ত অনুযায়ী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর অঞ্চলটি পাকিস্তানেরই প্রাপ্য ছিল। কথা ছিল কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ কাশ্মীরী জনগণই নির্ধারণ করবে, ভবিষ্যতে তারা ভারতের সাথে একত্রীভূত হবে, না পাকিস্তানের সাথে অংগীভূত হবে, না তারা স্বশাসন প্রতিষ্ঠা করবে, তা কাশ্মীরের জনগণই নির্ধারণ করবে। এ ব্যাপারে যে কোন বিরোধ নিরসনে জাতিসংঘ কর্তৃক গণভোটের চূড়ান্ত রায়কে তারা মেনে নিবে। কাশ্মীরের তৎকালীন হিন্দু মহারাজা হরি সিংহ, গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন এবং চানক্যের উত্তরসূরী জওহরলাল নেহেরু একথা ভাল করেই জানতেন, কাশ্মীরে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধায়নে গণভোট অনুষ্ঠিত হ'লে কাশ্মীরী জনগণ পাকিস্তানের পক্ষেই রায় দিবে। শতকরা ৮০ ভাগ মুসলিম জনগণ কখনই ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিবে না। লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও আধুনিক চানক্য পণ্ডিত নেহেরুর কূটনৈতিক চালের নিকট হিন্দু মহারাজা হরি সিং নিজস্ব স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর সকল আশা আকাংখ্যা পদদলিত করে ভারতীয় ইউনিয়নে একত্রীভূত হবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। মুসলিম জাতীয়তাবাদী দলগুলি হরি সিং-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করলে তিনি নেহেরুর সাহায্য কামনা করেন। নেহেরু তথা ভারতীয় শাসক গোষ্ঠী অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে কাশ্মীরকে ভারতের সাথে একত্রীভূত হবার শর্ত সাপেক্ষে সামরিক সাহায্য প্রদানে রাযী হয়। নেহেরুর ভারতীয় বাহিনী ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর কাশ্মীরে সৈন্য পাঠায় এবং জম্মু-কাশ্মীরের বিরাট অংশ দখল করে নেয়। এর ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং ফলশ্রুতিতে ১৯৪৮ সালে দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয়। এ যুদ্ধে পাকিস্তান কাশ্মীরের এক তৃতীয়াংশ ভূমি দখল করে, যার নামকরণ হয় 'আযাদ কাশ্মীর' এবং ভারত দখল করে দুই তৃতীয়াংশ। দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধের পরেও বিরোধ এবং উত্তেজনা চলতেই থাকে। ১৯৪৮ সালের ১৩ আগস্ট এবং ১৯৪৯ সালের ৫ জানুয়ারীতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের উদ্যোগে যুদ্ধ বিরতি লাইন টেনে কাশ্মীরকে কার্যতঃ দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কাশ্মীরের ভারতভুক্তির প্রাক্কালে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন বিভক্তির মূলনীতির সাথে সংগতি রেখে ঘোষণা দিয়েছিল-

'ভারত সরকারের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী কোন রাজ্যের ভারতভুক্তি বিতর্কিত হ'লে এ রাজ্যের জনগণই তাদের ইচ্ছানুযায়ী সে অন্তর্ভুক্তি চূড়ান্ত করবে। কাশ্মীর রাজ্যে আইন শৃংখলা পুনঃস্থাপিত হবার সাথে সাথে এ রাজ্যের ভারতভুক্তির বিষয়টি জনগণের ইচ্ছানুযায়ী মীমাংসিত হবে'। ১৯৪৭ সালের ১লা নভেম্বর মাউন্টব্যাটেনই জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠানের পরামর্শ দেন।

১৯৪৭ সালের ২৬শে নভেম্বর পণ্ডিত নেহেরু বেতার ভাষণে বলেছিলেন, 'জনগণের ভোটের শর্তে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি স্বীকার করা হয়েছে। ভারত সরকার তা অবশ্যই পালন করবে। কোন নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলীর ব্যবস্থাধীনে গণভোট গ্রহণ এবং জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা পূরণ করা হবে'।

কাশ্মীর প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন করে নেহেরু আরও বলেছিলেন, 'আমরাই কাশ্মীর প্রশ্নটি জাতিসংঘে উপস্থাপন করেছি এবং শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। একটি মহান জাতি হিসাবে আমরা কিছুতেই সে প্রতিশ্রুতি হ'তে সরে দাঁড়াতে পারিনা। চূড়ান্ত নিষ্পত্তির দায়িত্ব আমরা কাশ্মীরী জনগণের কাছে অর্পণ করেছি এবং তাদের সিদ্ধান্ত ও বিচারবোধকে মান্য করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ'।

তিনি আরও বলেছিলেন, 'যথার্থ গণভোটের পর যদি কাশ্মীরের জনগণ বলে আমরা ভারতের সাথে থাকতে চাই

না, তবে আমরা সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ সিদ্ধান্ত আমাদেরকে পীড়া দিলেও আমরা তা মেনে নিব। আমরা তাদের বিরুদ্ধে কোন সৈন্য পাঠাব না। আমরা তা গ্রহণ করব যদিও এতে আমরা ব্যথিত হব'।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এ রকম শত শত প্রতিশ্রুতি প্রদান সত্ত্বেও আজও সেখানে গণভোটের ব্যবস্থা করা হয়নি। বরং ১৯৪৮ হ'তে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত কমপক্ষে পাঁচবার জাতিসংঘ কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করলে চানক্যের অনুসারী ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কৌশলে তা এড়িয়ে যান। অথচ একটা গণভোটের শর্তেই ভারত অস্থায়ীভাবে কাশ্মীরের ভারতভুক্তির কথা স্বীকার করে নিয়েছিল।

ভারতীয় নেতাদের মিথ্যাচারের ইতিহাস তাদের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কদর্য চেহারার সাথে মৌর্য যুগের প্রতারক কূটনীতিবিদ চানক্যের কোন অমিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কাশ্মীরী জনগণ রক্ত দিয়ে আজ উপলব্ধি করছে কত জঘন্য ভারতীয় নেতাদের কুমনোবৃত্তি। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আর ধোঁকা দিয়ে ১৯৫৭ সালের ২৬ জানুয়ারী চতুর পণ্ডিত নেহেরু আনুষ্ঠানিকভাবে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্পন্ন করেন এবং ভারতীয় সংবিধানের ১নং ধারায় কাশ্মীরকে ভারতীয় ইউনিয়নের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ৩৭০ নং ধারা মতে কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে কেন্দ্রের হাতে এ অঞ্চলের নিরাপত্তা, বৈদেশিক নীতি এবং যোগাযোগের বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, ভারতের এ ন্যক্কারজনক ভূমিকাকে সহায়তা করে তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী সোভিয়েত রাশিয়া। রাশিয়া বার বার ভেটো (Veto) প্রয়োগের মাধ্যমে নিরাপত্তা পরিষদের সবগুলি প্রস্তাব বানচাল করলে কাশ্মীরে গণভোট এবং ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের আশা বিলুপ্ত হয়। এরপর ১৯৬৫ সালে দু'দেশের মধ্যে কাশ্মীরকে নিয়ে ১১ দিনের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। এখানে সোভিয়েত রাশিয়া ভারতের পক্ষে ওকালতি করলেও তারই প্রচেষ্টায় 'তাসখন্দে' একটি যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধ বিরতি রেখা কেউ লংঘন না করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করলেও কেউ তা সঠিকভাবে মেনে চলেনি। কিন্তু কাশ্মীরের ভারত অন্তর্ভুক্তি বিষয়টি পাকিস্তান কখনো মেনে নেয়নি। ফলে বিষয়টি আজো অমীমাংসিত রয়ে যায়।

১৯৮৭ সালের ১লা জুন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ভারতের সৃষ্ট শ্রীলংকার তামিল গেরিলাদের সাহায্যার্থে ভারতীয় বিমান দিয়ে রসদপত্র ফেলার নির্দেশ দেন। রাজীব গান্ধী ভারতীয় বাহিনীর এই অপারেশনের নাম দিয়েছিলেন 'অপারেশন পোমালি' এবং এই আগ্রাসী তৎপরতার পর তিনি মন্তব্য করেন, 'আমি কি মেসেজ দিতে চেয়েছি, প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধন হয়তো তা বুঝতে পেরেছেন'।

অতঃপর শ্রীলংকা ১৯৮৭ সালের ২৯ জুলাই ভারতের সাথে আনুষ্ঠানিক চুক্তি করতে বাধ্য হয় এবং শ্রীলংকার শান্তি রক্ষার্থে 'IPKF' (Indian Peace Keeping Force) শ্রীলংকার জাফনা দ্বীপের মাটিতে পা রাখে। এভাবেই ভারত চানক্য নীতি অনুসরণ করে আঞ্চলিক পুলিশী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এছাড়া ভারত ১৯৮৮ সালে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত শান্তিপ্রিয় একটি মুসলিম রাষ্ট্র মালদ্বীপে আঞ্চলিক কর্তৃত্ব যাহির করতে সৈন্য পাঠায়।

(৪) ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা কি ছিল সবার জানা আছে। দক্ষিণ এশিয়ায় আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী দখলদার শক্তি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য হীন স্বার্থে ভারত আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছে। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের পরিস্থিতিই প্রমাণ করে ভারতের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল। '৭১-র মুক্তিযুদ্ধে ভারত আমাদের সাহায্য করেছিল একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, কিন্তু ভারত কখনও চায়নি বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্ব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হউক। ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন শক্তিশালী দেশ হিসাবে দেখার লক্ষ্যে নয়, শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশকে একটি আশ্রিত রাষ্ট্র হিসাবে পাবার লক্ষ্যে '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছিল। তার বড় প্রমাণ, একাত্তরে ভারত নিজের হাতের মুঠোয় পেয়ে মুজিবনগরের অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে ভারতের সাথে অসম ৭ দফা চুক্তি করতে বাধ্য করা হয়। এ চুক্তি 'গোপন ৭ দফা চুক্তি' নামে খ্যাত, যা আজ পর্যন্ত ভারত এবং বাংলাদেশের দু'দেশের কোন সরকারই প্রকাশ করেনি। চুক্তির শর্তগুলি হচ্ছে-

(এক) যারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে শুধু তারাই প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিয়োজিত থাকতে পারবে। বাকীদের চাকুরীচ্যুত করা হবে এবং সেই শূন্যপদ পূরণ করবে ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।

(দুই) বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে (কতদিন অবস্থান করবে তার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় না)। ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাস থেকে আরম্ভ করে প্রতি বছর এ সম্পর্কে পুনরীক্ষণের জন্য দু'দেশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

(তিন) বাংলাদেশের কোন নিজস্ব সেনাবাহিনী থাকবে না।

(চার) আভ্যন্তরীণ আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য মুক্তবাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে।

(পাঁচ) সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অধিনায়কত্ব দেবেন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান, মুক্তিবাহিনী সর্বাধিনায়ক নন এবং যুদ্ধকালীন মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কত্বে থাকবে।

(ছয়) দু'দেশের বাণিজ্য হবে খোলা বাজার (ওপেন মার্কেট) ভিত্তিক। তবে বাণিজ্যের পরিমাণ হবে বছর ওয়ারি এবং যার পাওনা সেটা স্টার্লিংয়ে পরিশোধ করা হবে।

(সাত) বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রশ্নে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের

সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে এবং ভারত যতদূর পারে এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে সহায়তা দেবে।

অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সাত দফা গোপন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নযরুল ইসলাম। কথিত আছে, ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর দেখার পর সৈয়দ নযরুল ইসলাম অজ্ঞান হয়ে যান।

উপরোক্ত চুক্তি অনুযায়ীই ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী লেফঃ জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী ভারতীয় লেফঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন, বাংলাদেশের কারো কাছে নয়। এই চুক্তির বলেই ভারত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সদস্যদের ভারতে আটকে রেখেছিল ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই চুক্তি বলেই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর পরাজয়ের পর পর বাংলাদেশের প্রতিটি যেলায় এক একজন ভারতীয় সামরিক অফিসারকে বসিয়ে দেয়া হয়েছিল সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে। বিজয়ের পরপরই ভারত যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫০ হাযার কোটি টাকার সম্পদ লুটে নেয়, তখন এই চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া বাংলাদেশ সরকার বা মুক্তিযোদ্ধাদের করার কিছুই ছিল না। এই চুক্তি বলেই ভারত বাংলাদেশ সরকারকে জিজ্ঞাসাবাদ না করে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীসহ ৯৩০০০ হানাদার সৈন্যকে অবলীলায় পাকিস্তানের কাছে ফিরিয়ে দেয়। এই চুক্তির জোরেই ভারত দিল্লীভিত্তিক যৌথ পাট কমিশন গঠনের মাধ্যমে পাটের আন্তর্জাতিক বাজার দখল করে নেয়।

অতঃপর ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশকে বাধ্য করে তথাকথিত ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তি করতে, যাকে এদেশের জনগণ ঘৃণাভরে গোলামী চুক্তি বলে আখ্যা দিয়েছে। ১৯৭৪ সালের ১৬ মে স্বাক্ষরিত সীমান্ত চুক্তি লংঘণ করে এখনো ভারত বাংলাদেশের আংগরপোতা, বেরুবাড়ী দখল করে রেখেছে। তাছাড়া ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর সৃষ্টি করা হয় শান্তিবাহিনী, যার দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসাবে 'র' তৈরী করে বঙ্গভূমি আন্দোলন।

ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী জন্মলগ্ন থেকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সীমান্তবর্তী দেশগুলির সাথে চানক্য নীতি প্রয়োগ করে আসছে। পাকিস্তান ও চীন হয়তো একটু ব্যতিক্রম হ'তে পারে। কারণ এ দু'টো দেশ সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে শক্তিশালী। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানকে পরাজিত করা ও পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে 'সিমলা' চুক্তিতে আবদ্ধ করা ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সাফল্য বলে বিবেচিত হ'তে পারে। কারণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর বিজয় ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দু জাতির হাযার বছরের প্রথম বিজয়। কথাটা বলেছেন ভারতীয় ফিল্ড মার্শাল ম্যানেক শ ও লেফঃ জেনারেল জগজিত সিং অরোরা। তবে সাম্প্রতিককালে ভারত-ইসরাঈল অপশক্তির সামরিক সহযোগিতা এ অঞ্চলের মুসলিম দেশগুলির জন্য একটা অশনিসংকেত। এ অঞ্চলে ইসলামের নব-উত্থানকে নির্মূল করার জন্য আঞ্চলিক সন্ত্রাসবাদের ধূয়া তুলে মুসলিম নিপীড়ন আরো বাড়তে পারে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ইসরাঈল যেমন মধ্যপ্রাচ্যে পশুশক্তি প্রয়োগ করে তাদের বহু সাধের 'Kingdom of David' প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে, ভারতও ঠিক তেমনি তাদের চানক্য নীতি প্রয়োগ করে এ অঞ্চলে একটি 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়েছে।

তাছাড়া অখণ্ড ভারত সৃষ্টির স্বপ্ন ছিল ভারতীয় নেতৃবৃন্দের চিরন্তন আকাংখা। আজও সেই স্বপ্ন তারা বিসর্জন দেয়নি। কংগ্রেস সভাপতি আচার্য্য কৃপালনী বলেছিলেন, 'কংগ্রেস অথবা ভারতীয় জাতি কখনই অখণ্ড ভারতের দাবী পরিত্যাগ করবে না'। ভারতের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রায়ই বলতেন, আজ হোক কাল হোক আমরা এক হব এবং বৃহৎ ভারতের প্রতি আনুগত্য দেখাব। অখণ্ড ভারতের আধুনিক স্বপ্নদ্রষ্টা চানক্য কূটবুদ্ধিমান পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তার 'Discovery of India' গ্রন্থে অখণ্ড ভারতব্যাপী সেই স্বপ্নের বিস্তারের কথাই উচ্চারণ করেছেন। এটা তো স্পষ্ট, রাজনৈতিকভাবে পরাজিত নেহেরু পাকিস্তানকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন ভবিষ্যতে ধ্বংস করার ক্ষতিকর আশা মেনে নিয়ে। সাময়িকভাবে বিজয়ী তার কন্যা ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের সাথে সে রকম করতে না পারলেও এ যাবৎ সকল ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের দিকে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ এযাবৎ ভারতের সাথে প্রতিটি চুক্তিই বাংলাদেশের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রসংগক্রমে এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের প্রাক্কালে কুমিল্লার কংগ্রেস নেতা আশরাফুদ্দীন চৌধুরী তার নেতা নেহেরুর কাছে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন, যে কংগ্রেস এতদিন পর্যন্ত ভারত বিভাগ মেনে নিবে না বলে শপথ নিয়েছিল, সেই কংগ্রেস ভারত বিভাগ মেনে নিচ্ছে কেন? নেহেরু উত্তরে লিখেছিলেন, 'কংগ্রেস কখনো পার্টিশন মেনে নেয়নি। তবে কখনো কখনো পরিস্থিতির চাপের মুখে, ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কিছু মেনে নিতে হয়। আমরা ভারত বিভাগ মেনে নিয়েছি শুধুমাত্র বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের শর্তে। কারণ এ পথেই আমরা অখণ্ড ভারতে ফিরে যাব'।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে অখণ্ড ভারত সৃষ্টি ভারতীয় নেতাদের চিরন্তন আকাংখা। ১৯৪৭ সালের ৫ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের তারকেশ্বরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনে সর্বভারতীয় হিন্দু নেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকর এক বাণীতে বলেছিলেন, 'প্রথমতঃ পশ্চিমবঙ্গে একটি হিন্দু প্রদেশ গঠন করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ যেকোন মূল্যে আসাম থেকে মুসলিম বিতাড়ন করে দু'টি হিন্দু প্রদেশের মাঝে ফেলে পূর্ব পাকিস্তানকে পিষে মারতে হবে'। শ্রী সাভার করের আকাংখা অনুযায়ী মুসলিম বেঙ্গলকে দ্বিখণ্ডিত করে এক অংশ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৪৭ থেকে

১৯৮৫ এর মধ্যে আসাম থেকে মুসলিম বিতাড়ন প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান নামটিও মুছে ফেলা সম্ভব হয়েছে। এখন বাকী রয়ে গেছে বাংলাদেশ নামটির অস্তিত্ব। সেটিও পশ্চিমবঙ্গকে 'বাংলা' নামকরণের মধ্যে ফেলে বিলীন করার অপচেষ্টা চলছে।

যারা নেহেরুর 'Discovery of India' এবং কে, সুব্রামানিয়ামের 'Indians Security Perspectives' বই দু'টি পড়েছেন, তারা নিশ্চয়ই বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি হওয়ার জন্য ভারতের খায়েশের কথা বিলক্ষণ জানেন এবং যারা পন্নিকরকে পড়েছেন তারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উপর ভারতের মেকিয়াভেলী দৃষ্টির ব্যাপারও স্বীকার করবেন। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্ররা এটা ভাল করেই জানেন যে, ১৯৩৫ সালের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ভিত্তিতে যখন বার্মাকে পৃথক করে দেওয়া হয়, তখন ভারতীয় কংগ্রেসের নেতারা তার তীব্র বিরোধিতা করেছিল। কারণ তখন তাদের মনে ছিল পেশোয়ার থেকে মান্দালয় পর্যন্ত বিশাল ভারতের প্রলোভন। অতএব পাঠক বুঝতে পেরেছেন যে, কেন ১৯৪৭ সালের বিভাগের সময় নেহেরু ও প্যাটেল চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চল পাওয়ার জন্য গোঁ ধরে ছিলেন এবং তাদের এ দাবী মিটিয়ে সন্তুষ্ট না করার জন্য র‍্যাডক্লিভ রোয়েদাদ বিলম্বে ঘোষণা করতে হয় ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনকে, যার পরিণতিতে পাঞ্জাব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। মেজর জেনারেল সুজান সিং উবান ভাত 'ফ্যান্টমাস এ্যাট চিটাগংঃ ফিফত আর্মি ইন বাংলাদেশ' বইয়ে ভারতের এ আশাবাদের ব্যাপারটি লুকাননি এবং উল্লেখ করেছেন যে, বার্মাকে ফেরত পেতে চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চল ও চট্টগ্রাম বন্দরের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় এই মেজর জেনারেল সুজান সিং উবান (যিনি এসএস উবান নামে বহুল পরিচিত) ছিলেন মুজিব বাহিনীর সংগঠক, যিনি 'র' এর প্রধান আর এন কাও-এর তত্ত্বাবধানে ১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে তথাকথিত মিজো গেরিলা দমনের নামে 'অপারেশন ঈগল' পরিচালনা করেন। এটি ছিল মূলতঃ শান্তি বাহিনী তৈরীর প্রথম ধাপ। বিশেষজ্ঞদের মতে, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের তলদেশে পঁচিশ বছর ব্যবহারযোগ্য উত্তোলনযোগ্য পঁচিশ মিলিয়ন টন গ্যাস রয়েছে। তাছাড়া ইউরেনিয়াম থাকারও সম্ভাবনা রয়েছে একথাও বলেছেন অনেকে। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' রামানুজ লক্ষণের এই আপ্ত বাণী রপ্ত করে ভারত 'ধীরে চল রজনীর' কৌশল নিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে। ভারতের লক্ষ্যই হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করা এবং বার্মাকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা। আমাদের তিন দিকে ভারত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। একদিকে বিশ্বের সাথে আমাদের সংযোগ সেটি হ'ল বার্মার সার্ভে। পার্বত্য চট্টগ্রাম যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহ'লে আমরা চারদিকে ভারত দ্বারা Land Blocked হয়ে যাব। সুতরাং কার সাধ্য আছে, দুর্ভাগা বাংলাদেশী মুসলিমদের খুব নিশ্চয়তার সাথে এ আশ্বাস দিবে যে, তাদের ভাগ্য সিকিম বা হায়দারাবাদের মত হবে না? যদি চানক্যের কৌশলী চিন্তার কোন প্রভাব দিল্লীর মাথায় থাকে তাহ'লে কেন্দ্রীয়ভাবে অবস্থিত আযাদ কাশ্মীর বা পাকিস্তানের চেয়ে প্রান্তস্থিত বাংলাদেশ অবশ্যই ভারতীয়দের পরবর্তী টার্গেট।

পরিশেষে আরো স্পষ্ট করে বলতে চাই, যে হিংস্র হায়েনার দল স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র হায়দারাবাদের বুক চিড়ে রক্তের বন্যা বইয়েছিল, হায়দারাবাদের মাটিকে ব্রাহ্মণ্যবাদের রক্তে কলুষিত করেছিল, সেই চানক্য মতাদর্শের দল যে আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে পিষে মারবে না, তার গ্যারান্টি কোথায়? সংসদীয় গণতন্ত্রই যে দেশের স্বাধীনতার একমাত্র রক্ষাকবচ নয়, কাজী লেন্দুপ দর্জির মত পোষ্য ভারতীয় দালালদের তৈরী সিকিম তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এরকম হাযারো কাজী লেন্দুপ দর্জি সৃষ্টি হয়েছে আমাদের দেশে, যারা যে কোন মুহূর্তে এদেশের মানচিত্র পরিবর্তন করতে এগিয়ে আসতে পারে। এদের মুখ থেকেই উচ্চারিত হচ্ছে '৪৭-এ দেশভাগ ভুল ছিল, দ্বি-জাতিতত্ত্ব ভুল ছিল, ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ নাকি ভুল ছিল ইত্যাদি। এসব কথাবার্তা যারা বলেন বিনয়ের সাথে সেসব বুদ্ধিজীবিদের প্রশ্ন করতে চাই যে, ভারতে বাঙ্গালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, গুজরাটি, মারাঠী, গুর্খা ইত্যাদি যাদের আচার-আচরণ, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ভাষাগত কোন সাদৃশ্য নেই তারা কি করে শুধু হিন্দুত্ববাদকে অবলম্বন করে এক হিন্দু জাতি হিসাবে বাস করছে?

আমাদের স্বাধীনতা অনেক দাম দিয়ে কেনা। এক সাগর রক্ত পেরিয়ে আমরা স্বাধীন হয়েছি। যাদের স্বাধীনতা নেই, তারাই শুধু জানে, কি নেই। কাশ্মীরবাসী, প্যালেস্টাইনী এবং হাল আমলে আফগানিস্তানী কিংবা ইরাকীদের জিজ্ঞেস করে দেখুন, পরাধীন দেশে কিংবা ভিন দেশের শাসকদের শাসনে তাদের দিন কিভাবে যায়, রাত কিভাবে আসে। তাই বলছি, আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে হায়দারাবাদ, জুনাগড়, গোয়া, সিকিম, কাশ্মীর, নেপাল ও ভুটানের ইতিহাস থেকে। মনে রাখতে হবে, চানক্য নীতির অনুসারী ভারতীয় আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্যের হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য দেশপ্রেমিক রাজনীতিকদের কোমর বেঁধে দাঁড়ানোর সময় আজ এসেছে। তা না হ'লে হায়দারাবাদ, সিকিম, ভূটান, কাশ্মীরীদের মতই আমাদের পরিণতি হবে এটা নিশ্চিত। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!!

[তথ্যসূত্রঃ ১. অতুল চন্দ্র রায়, ভারতের ইতিহাস, ১ম খণ্ড ২. মাসুদুল হক, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ ৩. ডঃ এম, আব্দুল মুমিন চৌধুরী, অপারেশন বাংলাদেশ ৪. আবু রুশদ, গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা -'বাংলাদেশে 'র' আগ্রাসী গুপ্তচরবৃত্তির স্বরূপ সন্ধান ৫. আহা পর্বত! আহা চট্টগ্রাম!! পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক স্মারক -অতন্দ্র জনতা বাংলাদেশ ৬. আরিফুল হক, হায়দারাবাদ ট্রাজেডী ও আজকের বাংলাদেশ ৭. বাংলা নাম দেশ -আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯ ৮. মাসিক সত্যের ডাক -১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ৯৯ই ৯. আরিফুল হক, কড়িডোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েই গেল অতঃপর কি? দৈনিক ইনকিলাব, ২ আগষ্ট ৯৯ইং ১০. ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী সাম্রাজ্যবাদ -ইহুদীবাদ ব্রাহ্মণ্যবাদের গুনমুগ্ধদের প্রতি 'খোলা চিঠি' -হারুনুর রশীদ।]

ভিন্ন চোখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শেখ মাফিজুল ইসলাম

দিন যতই গড়াচ্ছে সময়ের প্রেক্ষিতে, ভাবনার আতিশয্যে, নান্দনিক বিচার-বিশ্লেষণে, দার্শনিক মতাদর্শে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খৃঃ) তাঁর সৃষ্টির সম্ভার নিয়ে ততই উজ্জ্বল হচ্ছেন। তাঁকে অবহেলা কিংবা উপেক্ষার স্পর্ধা কেউই রাখে না, প্রশ্নই ওঠে না। তবু জিজ্ঞাসার শেষ নেই। একদিকে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র, অন্যদিকে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র। অর্থাৎ একদিকে আধ্যাত্মিকতা অন্যদিকে আভিজাত্য এই দুই সত্তার সংমিশ্রণে রবীন্দ্রনাথের লেখক মানস ও ব্যক্তি মানসের ভিত্তিভূমি তৈরী হয়েছিল।

কোলকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে সার্চলাইট ফেললে ভিন্ন মাত্রার রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া যায়। খুঁজে পাওয়া যায় জমিদারতন্ত্রের চিরচেনা রূপটি। খুবই সাধারণ অখ্যাত মানুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষ। 'ঠাকুর' পদবিটাও বরাবর ছিল না। পূর্ব পুরুষ পঞ্চানন কুশারী শ্রমিকের কাজ করতেন। শ্রমিকদের মধ্যে কিছুটা মাতব্বর গোছের ভূমিকা পালন করায় সাধারণ শ্রমিকরা তাকে 'ঠাকুর মশাই' বলে ডাকত। ঐ 'ঠাকুর মশাই' থেকেই ঠাকুর পদবির সৃষ্টি। বাদ পড়ে যায় 'কুশারী' পদবিটি। পূর্ব পুরুষদের নামগুলিও ছিল মামুলি আড়ম্বরহীন। যেমন- কামদেব, জয়দেব, রতিদেব ও শুকদেব ইত্যাদি। কামদেব ও জয়দেব পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। নতুন নাম হয় কামালুদ্দীন ও জামালুদ্দীন। যার কারণে রবীন্দ্রনাথের বংশকে একটা কলঙ্ক (?) বহন করতে হয়। তারা ব্রাহ্মণ হ'লেও (পীর-ওলী থেকে) 'পীরালি ব্রাহ্মণ'। সেই যন্ত্রণা ঠাকুর পরিবারের দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথসহ কমবেশী অনেককেই ভোগ করতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ইংরেজী জানা আইনপড়া তুখোড় বৈষয়িক লোক ছিলেন। তাদের বড় দেবতা ছিল অর্থ ও স্বার্থ। এই উদ্দেশ্য মাথায় রেখে দ্বারকানাথ হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে রামমোহন রায়ের ব্রহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এ নিয়ে রটনা কম হয়নি। তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল বিস্ময়কর। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, কবি রবীন্দ্রনাথ বৌদি কাদম্বরী দেবীকে খুব ভালবাসতেন। কাদম্বরীর মৃত্যুর পর তার স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ আজীবন ভুলতে পারেননি। কাদম্বরী কি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছিলেন? নাকি বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়? ধরে নেওয়া হয়, এটি আত্মহত্যার ঘটনা। সেদিন ইংরেজ পুলিশ কাদম্বরীর লাশ নিয়ে যেতে পারেনি। পিতা দেবেন্দ্রনাথের আদেশে পুলিশকে প্রাসাদে আসতে হয় এবং রিপোর্টে উল্লেখ করতে বাধ্য করা হয়, এটি স্বাভাবিক মৃত্যু। দেশের সমস্ত পত্র-পত্রিকায় নির্দেশ পাঠানো হয়, মৃত্যু সংবাদটি ছাপানো যাবে না। তার (কাদম্বরীর) মৃত্যুর পর দেহটি মর্গে না পাঠিয়ে বাড়ীতে করোনার ডাকা হয় মহর্ষির নির্দেশে। সেই সঙ্গে দেহ কাটাকাটি করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। আত্মহত্যার সংবাদটি যাতে সংবাদপত্রে ছাপা না হয় তার ব্যবস্থা করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।[১]

পিতা দেবেন্দ্রনাথ কেন চৌদ্দ নম্বর সন্তান রবীন্দ্রনাথকে জমিদার হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন? এটাও কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। তাহ'লে কী ধরে নিতে হবে শাসন-শোষণ, অত্যাচার ও ছলচাতুরীতে, কূটকৌশলে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যোগ্যতম? অনেকের মতে, পিতৃদেব ভুল করেননি। জমিদারদের বিরুদ্ধে কলম ধরলে নেমে আসত অত্যাচারের খড়্গ। নির্ভীক সাংবাদিক কুষ্টিয়ার হরিনাথকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। অপরাধ সত্য কথা বলা। তিনি তার 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকায় জমিদারদের নির্মম চরিত্র তুলে ধরেছিলেন। কটাক্ষ করে লিখেন 'ধর্ম মন্দিরে ধর্মালোচনা আর বাহিরে আসিয়া মনুষ্য শরীরে পাদুকা প্রহার একথা আর গোপন করিতে পারি না'।[২]

তিনি আরো লিখেন, 'ইত্যাদি নানা প্রকার অত্যাচার দেখিয়া বোধ হইল পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়স্থ মৎস্যের যেমন মা-বাপ নাই; পশুপক্ষী ও মানুষ, যে জন্তু যে প্রকারে পারে মৎস্য ধরিয়া ভক্ষণ করে, তদ্রূপ প্রজার স্বত্ব হরণ করিতে সাধারণ মনুষ্য দূরে থাকুক যাহারা যোগীঋষি ও মহা বৈষ্ণব বলিয়া সংবাদপত্র ও সভা-সমিতিতে প্রসিদ্ধ তাহারাও ক্ষুৎক্ষামোদর'।[৩] এসব মহর্ষীর সঙ্গে তখনকার অফিসার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরা ম্যাজিস্ট্রেটদের দহরম-মহরম সম্পর্ক থাকায় তারা কঠোর পদক্ষেপ নিতেন না। যারা নিতেন তাদের বদলি কিংবা চাকুরিচ্যুতির ভয় থাকত। জমিদারদের কাজকর্মের সাফায় গাওয়ার জন্য বেশকিছু সংবাদপত্র সক্রিয় ছিল। যেমন- 'হিন্দুরঞ্জিকা', 'হিন্দুহিতৈষিণী', দেশহিতৈষী', 'হেরল্ড', 'বেঙ্গল হরকরা', 'আপার ইন্ডিয়া গেজেট' 'বঙ্গদূত', 'সুধাকর' প্রভৃতি। এগুলি ছিল জমিদারদের সাহায্য-সহযোগিতাপুষ্ট। প্রজারা বিদ্রোহ করলে অলীক কল্পকথা রচনা করে জমিদারদের দায়ী না করে প্রজাদের ওপর চাপানো হ'ত। এদের মধ্যে পান্ডা হিসাবে কাজ করত অমৃতবাজার পত্রিকা।[৪]

গরীব প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায়ের ব্যাপারটিও ছিল হৃদয়বিদারক। গরুর গাড়ী চলার সময় ধূলি উড়লে দিতে হ'ত 'ধূলাট কর', গাছ লাগালে 'চৌথকর, আখের গুড় তৈরী করলে 'ইক্ষুগাছ কর', মৃত পশু ফেললে 'ভাগাড় কর', নৌকায় মাল ওঠানামা করলে 'কয়ালি', জমিদারদের সঙ্গে দেখা করতে হ'লে 'নযরানা', হাজতে গেলে 'গারদ সেলামি' ইত্যাদি উদ্ভট করের ব্যবস্থা ছিল।[৫]

---

১. অমিতাভ চৌধুরী, ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ।
২. অশোক চট্টোপাধ্যায়, প্রাক-বৃটিশ ভারতীয় সমাজ।
৩. কাঙাল হরিনাথের 'অপ্রকাশিত ডায়েরী'।
৪. ডঃ বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, তৃতীয় খণ্ড।
৫. শ্রী স্বপন বসু, গণঅসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ।

হিন্দু-মুসলিম বিভেদের বীজ প্রথমে অঙ্কুরিত হয় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে। হিন্দুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গঠিত হয় 'হিন্দুমেলা' ও জাতীয় সভা (১৮৬৯)। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ভারত বর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা হিন্দুমেলাতেই সর্বপ্রথম লক্ষণীয়। এই মেলায় দেশের স্তবগানগীত দেশানুরাগের কবিতা গঠিত, দেশী শিল্প, ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত...। এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা। ... আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কেবল আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে- ইহা স্বদেশের জন্য, ভারত ভূমির জন্য'।[৬]

সুতরাং সহজেই অনুমেয় অনুন্নত হরিজন, নিপীড়িত নিষ্পেষিত মুসলিম ও অহিন্দু এবং হিন্দুমেলার সমর্থকদের মাঝে সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর তুলে দেওয়া বা সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ তৈরী করাই ছিল এই মেলা বা সভার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এমন আর একটি বিষবৃক্ষ ছিল 'সঞ্জীবনী সভা'। সেখানে ঋকদেবের মন্ত্র পড়ে সভ্যদের দীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

রবীন্দ্র যুগে মুসলিমবিরোধী ষড়যন্ত্রকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা মুসলিম সমাজের ছিল না। প্রতিবাদের যেটুকু ভাষা ছিল তাও অত্যন্ত ক্ষীণ এবং নিচু স্বরের। ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ তাঁর 'আমাদের সাহিত্যিক দরিদ্রতা' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'কি পরিতাপের বিষয়, আমাদের শিশুগণকে প্রথমেই রাম-শ্যাম, গোপালের গল্প পড়িতে হয়। সে পড়ে গোপাল বড় ভাল ছেলে। কাশেম বা আব্দুল্লাহ কেমন ছেলে সে তাহা পড়িতে পায় না। এখান হইতেই তাহার সর্বনাশের বীজ রোপিত হয়। তারপর সে তাহার পুস্তকে রাম-লক্ষণের কথা কৃষ্ণ-অর্জুনের কথা, সীতা-সাবিত্রীর কথা, বিদ্যাসাগরের কথা, কৃষ্ণকান্তের কথা ইত্যাদি হিন্দু মহাজনদিগেরই আখ্যান পড়িতে থাকে। সম্ভবত তাহার ধারণা জন্মিয়া যায় আমরা মুসলমান ছোট জাতি, আমাদের মধ্যে বড়লোক নেই।... হিন্দু বালকগণ ঐ সকল পুস্তক পড়িয়া মনে করে আমাদের অপেক্ষা বড় কেহ নয়। মুসলমানরা নিতান্ত ছোট জাত। তাহাদের মধ্যে ভাল লোক জন্মিতে পারে না। এই প্রকারে রাষ্ট্রীয় একতার মূলোচ্ছেদ করা হয়। ... তাহাতে বুদ্ধদেবের জীবনী চারিপৃষ্ঠা আর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনী অর্ধপৃষ্ঠা মাত্র। অথচ ক্লাসে হয়ত একটি ছাত্রও বৌদ্ধ নহে। আর অধিকাংশ ছাত্র মুসলমান। ... মূল পাঠ্য ইতিহাসে হিন্দু রাজাদের সম্বন্ধে অগৌরবজনক কথা প্রায় ঢাকিয়া ফেলা হয়, আর মুসলমানদের বেলা ঢাকঢোল বাজাইয়া প্রকাশ করা হয়। গুণের কথা বড় একটা উল্লিখিত হয় না। ফল দাঁড়ায় এই- ভারত বর্ষের ইতিহাস পড়িয়া ছাত্ররা বুঝিল, মুসলমান নিতান্ত অপদার্থ, অবিশ্বাসী, অত্যাচারী এবং নিষ্ঠুর জাতি। পৃথিবী হইতে তাহাদের লোপ হওয়াই মঙ্গল'।

৬. *দ্রঃ জীবন স্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী-১০, পৃঃ ৬৬।*

কবি রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের পূর্ণ মুসলমান হয়ে থাকাটা বোধ হয় পসন্দ করতেন না। সেজন্য তিনি বলতেন- 'মুসলমানরা ধর্মে ইসলাম অনুরাগী হ'লেও জাতিতে তারা হিন্দু। কাজেই তারা 'হিন্দু-মুসলমান'।[৭]

ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সহানুভূতিশীল তেমন কিছু লেখার প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেননি। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তার বোধোদয় ঘটে। একবার ভারতের বোম্বাই শহরে পয়গম্বর দিবস (১৯৩৩, ২৬ ডিসেম্বর) উদযাপন হয়। সেবার কবি রবীন্দ্রনাথ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পক্ষে একটি বাণী পাঠান। সেটি পাঠ করে শোনান খ্যাতনামা কংগ্রেস নেত্রী সরোজিনী নাইডু। বাণীতে লেখা হয় 'জগতে যে সামান্য কয়েকটি মহান ধর্ম আছে, ইসলাম ধর্ম তাদেরই অন্যতম। ... সভ্য ও শাশ্বতকে যাঁরা জেনেছেন ও জানিয়েছেন, তাঁরা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র এবং মানুষকেও তাঁরা চিরকাল ভালবেসে এসেছেন'। ১৯৩৪-এর ২৫ জুন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্মদিন উপলক্ষে কবি আরও একটি বাণী পাঠান। সেটি আকাশবাণী রেডিও-তে প্রচার করা হয়। বাণী পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন স্যার আব্দুল্লাহ সোরাবর্দী। সেই বাণীর শেষ বাক্যটি হ'ল... 'আজকের এই পুণ্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে মুসলিম ভাইদের সঙ্গে একযোগে ইসলামের মহাঋষির [মুহাম্মাদ (ছাঃ)] উদ্দেশ্যে আমার ভক্তি উপহার অর্পণ করে উৎপীড়িত ভারতবর্ষের জন্য তাঁর আশীর্বাদ ও সান্ত্বনা কামনা করি'। স্যার আব্দুল্লাহ ঐ বক্তব্যটি ছেপে জনগণের মধ্যে পরিবেশন করেছিলেন।[৮]

রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের মূল্যায়ন করতে পেরেছিলেন তাঁর জীবনের অন্তিম সময়ে এসে। তিনি লেখেন, 'বাংলাদেশের পূর্বভাগে মুসলমানের সংখ্যা অধিক। ধর্মগত ও সমাজগত কারণে মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে ঐক্য বেশী। সুতরাং শক্তির প্রধান উপকরণ তাদের মধ্যে নিহিত হইয়া আছে'।[৯]

কবি রবীন্দ্রনাথকে দয়ার প্রতিমূর্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু অধ্যাপক অমিতাভ চৌধুরী তাঁর 'জমিদার রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সামন্তবাদী প্রজাপীড়ক জমিদার ছিলেন। তার দফায় দফায় খাজনা বৃদ্ধি এবং জোর-জবরদস্তি করে তা আদায়ের বিরুদ্ধে ইসমাঈল মোল্লার নেতৃত্বে শিলাইদহে প্রজা বিদ্রোহ হয়েছিল। মুসলমান প্রজাদের টিট করার জন্য নমঃশূদ্র প্রজা এনে বসতি স্থাপনের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি রবীন্দ্রনাথের মাথা থেকেই বের হয়েছিল'। পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের কথা ভেবে ইংরেজ সরকার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ঘোষণা দেয়। ঘোষণা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী, রাজা, মহারাজা ও স্যারেরা। চরম

৭. *আবুল কালাম শামসুদ্দিন, 'অতীত দিনের স্মৃতি'।*
৮. *অমিতাভ চৌধুরী, ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ।*
৯. *রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম ও ১৪শ' খণ্ড।*

বিরোধিতা করেন তারা। ১৯১২ সালে ২৮ মার্চ কোলকাতার গড়ের মাঠে বিশাল সমাবেশ হয়। ঐ বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত সভার সভাপতি হন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাহ'লে কি তিনি চাননি মুসলমান কৃষক ও শ্রমিক সন্তান এবং অনুন্নতরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলো পেয়ে ধন্য হোক? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিদ্রূপ করে বলা হ'ত 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়'। শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় হয়েছে যেটি এখন প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত।

রবীন্দ্রনাথ তার মৃত্যুর (১৯৪১, ২২ শ্রাবণ) পর তাকে নিয়ে মাতামাতি করতে নিষেধ করে যান। তবু ঠাকুর বাড়ীর কোলাপসিবল গেট ভেঙ্গে তার মৃতদেহ হাযার হাযার জনস্রোতের মাঝে আনা হয়। মরদেহ সাজানো খাট ঘিরে শ্লোগান ওঠে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি জয়', 'বন্দেমাতরম'। রবী-ভক্তরা কবির স্মৃতি বাড়ীতে রাখার জন্য সারা জীবন সংরক্ষিত মাথা ভর্তি শুভ্রকেশ, চিত্তাকর্ষক দাড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়। অধ্যাপক অমিতাভ চৌধুরী বেদনা-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তার 'ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে লিখেছেন- 'যখন মুখাগ্নি করা হয়, তখন রবীন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল বিকৃত। জনতার এতই তার প্রতি অনুরাগ যে, স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে তার মাথার চুল ও মুখের দাড়ি সব উপড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই হ'ল গিয়ে কবি প্রয়াণের শেষ দৃশ্য। সারা জীবন সুন্দরের সাধক রবীন্দ্রনাথকে চিরবিদায় নিতে হ'ল অসুন্দরের হাতে'।

॥ সংকলিত ॥

বের হয়েছে! বের হয়েছে!! বের হয়েছে!!!

দেশের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী কর্তৃক ২০০৫ সালে দাখিল পরীক্ষার্থীদের জন্য 'দিশারী প্রশ্নপত্র সাজেশান্স' বের হয়েছে। আপনার কপির জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন

যোগাযোগের ঠিকানা

সাজেশান্স প্রস্তুত কমিটি

দিশারী প্রশ্নপত্র সাজেশান্স'

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া (বিমানবন্দর রোড)

পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

ফোন (০৭২১) ৭৬১৭৪১, ৭৬১৩৭৮।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ফাযিল-কামিলের মান প্রদানে ঢাকায় স্বতন্ত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চাই

*মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান**

অনেক জল্পনা-কল্পনা, আলাপ-আলোচনা, কমিশন গঠন, আন্দোলন, যুক্তি-তর্ক ইত্যাদির পর সরকারের মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত কমিটি মাদরাসার ফাযিল ও কামিল ডিগ্রীর মান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বড়ই খুশীর কথা, আনন্দের কথা। অনেক পূর্বেই এমনটি হওয়া উচিত ছিল। এটা কেন যে এত বিলম্বে হ'ল, তাও বোধগম্য নয়। সরকার কর্তৃক প্রণীত ডিগ্রী ও মাস্টার্স সমমানের সিলেবাস পাঠ করে, বাংলা, ইংরেজী, অংক, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি সমুদয় বিষয়ে পড়াশুনা করেও এতদিন পর্যন্ত ফাযিল-কামিল পাস করা ছাত্ররা তাদের অর্জিত ডিগ্রীর মান পায়নি, বিষয়টি বিস্ময়ের উদ্রেক করে বটে। যাহোক, অবশেষে মাদরাসা ও মাদরাসা শিক্ষিতদের প্রতি সরকার দয়ার দৃষ্টি দিয়েছেন; সুনজরে তাকিয়েছেন। ফাযিল কামিল পাস ছাত্রদের প্রতি এটাও এক বিরাট অর্জন।

মাদরাসার ফাযিল ও কামিল পাস ছাত্ররা সাধারণ শিক্ষার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সমমান পেতে যাচ্ছেন, এটা এক মহা সুসংবাদ। এ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা ভূমিকা পালন করেছেন, তারা যে একটি বিরাট পুণ্যময় কাজে অংশ নিয়েছেন তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। ন্যায্য অধিকার হারা, নৈতিক শিক্ষা প্রাপ্ত, উন্নত চরিত্রের অধিকারী এ মাদরাসা ছাত্রদের শিক্ষার মানের জন্য যারা অবদান রেখেছেন তাদের জন্য রাব্বুল আলামীনের দরবারে উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

যতদূর শুনেছি, ফাযিল-কামিলকে মান দেয়ার বিষয়টি বিচার-বিশ্লেষণ এবং এ সম্পর্কে সুপারিশ প্রদানের জন্য কয়েকজন মন্ত্রীর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। উক্ত কমিটি ফাযিল-কামিলকে যথাক্রমে সাধারণ শিক্ষার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সমমান দেয়ার সুফারিশ করেছে, তবে তা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। এ সুফারিশের পর পরই কেউ কেউ উক্ত কমিটির সিদ্ধান্তের পক্ষে অবস্থান নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই ফাযিল-কামিল ডিগ্রীর মান দেয়ার বিষয়টির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন, কেউবা এ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ঢাকায় 'এফিলিয়েটিং' ক্ষমতা সম্পন্ন একটি স্বতন্ত্র 'ইসলামী আরাবী বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করে তার অধীনে এ মান দেয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত করতে বলছেন, কোনক্রমেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নয়। উভয়পক্ষই নিজ নিজ মতের পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করছেন নিজ নিজ অবস্থানের সঠিকতা প্রমাণের জন্য যাবতীয় তৎপরতা চালাচ্ছেন

* সদস্য সচিব, শারী'আহ কাউন্সিল, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড।

নিরলসভাবে। শেষ পর্যন্ত ফাযিল-কামিল ডিগ্রীর সরকারী স্বীকৃতি ও মান দেয়ার বিষয়টি বাস্তবিক পক্ষে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন।

প্রথম পক্ষের তৎপরতা দ্বিতীয় পক্ষের তৎপরতার তুলনায় অনেক বেশী ও জোরালো অনুভূত হচ্ছে। প্রথম পক্ষের লোকজন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাযিল-কামিলের মান দেয়ার সরকারী সিদ্ধান্ত এ যুক্তিতে সমর্থন করছেন যে, মান দেয়াটা বড় কথা, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেয়া হ'ল সেটা বড় কথা নয়। এখন যদি নতুন কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মান দিতে বলা হয় তাহ'লে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পড়ে বিষয়টি আবার পিছিয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে যে মহলটি এ মান দেয়ার বিরুদ্ধে তারা এ বিতর্ককে বিষয়টি পিছিয়ে দেয়ার অজুহাত হিসাবে দাঁড় করাতে পারে। আর এ প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত হ'লে ফাযিল-কামিলের মান দেয়া সংক্রান্ত সরকারের এ মহৎ উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'তে পারে। অতএব যত দ্রুত সম্ভব ফাযিল ও কামিলের মান নিয়ে নেয়া দরকার। যেহেতু দীর্ঘদিন পর সরকার ফাযিল ও কামিল ডিগ্রীর মান দেয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাই তা মেনে নেয়া উচিত। পদ্ধতিগত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে পরবর্তীতে তা শুধরিয়ে নেয়া যাবে।

অপরদিকে যারা স্বতন্ত্র ইসলামী আরাবী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলছেন তাদের কথা হ'ল, মাদরাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার স্বার্থে একটি স্বতন্ত্র 'ইসলামী আরাবী বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করে তার অধীনে এ মান দেয়া প্রয়োজন। তাদের যুক্তিও খুবই মযবূত। এ পক্ষের বক্তব্য হ'ল, নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত, উন্নত সামাজিক চরিত্রের অধিকারী একদল সুনাগরিক তৈরীর কাজটি মূলতঃ আঞ্জাম দিচ্ছে একমাত্র মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। বর্তমান আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এ ভূমিকা পালনে অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিবেশ-পরিস্থিতি যে হারে অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে, তাতে আগামীতে এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নৈতিক মানসম্মত দক্ষ ও সুনাগরিক তৈরীর ভূমিকা কতটুকু পালন করতে পারবে তা নিয়েও রয়েছে যথেষ্ট সন্দেহ।

এমতাবস্থায় এ ধরনের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাযিল-কামিলের মান দেয়ার বিষয়টি সমর্পণ করলে, মাদরাসা শিক্ষার মান, ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যেতে পারে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা রূপান্তরিত হ'তে পারে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার মতোই আরেকটি শিক্ষা ব্যবস্থায়। ফাযিল-কামিল পাশ করা ছেলেরাও হারাতে পারে তাদের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ জাতির শেষ আশা ভরসার প্রতীক এ মাদরাসা শিক্ষাও যদি সাধারণ শিক্ষার মতো হয়ে যায়, এ শিক্ষায় শিক্ষিতরা তাদের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারায়, মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষা হারিয়ে তথাকথিত শিক্ষিত হিসাবে গড়ে উঠে, তাহ'লে তো এ জাতির জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। তারা বলছেন, মাদরাসা ছাত্ররা যদি তাদের অর্জিত ডিগ্রীর সরকারী স্বীকৃতি ও মান পায়, কিন্তু ঐতিহ্য চরিত্র সবই হারায়, তাহ'লে এমন মান পাওয়ার চেয়ে না পাওয়াই ভাল। তারা বলছেন, মাদরাসা শিক্ষার ঐতিহ্য, গুণগত অবস্থান ইত্যাদি বহাল রেখে ঢাকায় একটি স্বতন্ত্র 'ইসলামী আরাবী বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করে তার অধীনে মান দেয়া হ'লে, তা ফলপ্রসূ ও অর্থবহ হবে।

নীতিগতভাবে আমি দ্বিতীয় দলের পক্ষে। তবে 'ইসলামী আরাবী বিশ্ববিদ্যালয়' নামের সাথে অত্যন্ত সংগত কারণে আমি ভিন্নমত পোষণ করছি। 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা' নামে এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। কিন্তু 'আরাবী বিশ্ববিদ্যালয়' বলতে তারা কি বুঝাতে চান তা মোটেই বোধগম্য নয়। এখানে কি শুধু আরাবী পড়ানো হবে, অন্য কিছু নয়? যেমনটি ভারতের সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতি ছাড়া অন্য কিছু পড়ানো হয় না। যদি এমনটি হয়, তাহ'লে এ দেশ ও জাতির জন্য এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন আদৌ আছে বলে মনে করি না। শুধু আরাবী শিখিয়ে একটি জাতিকে উন্নত জাতিতে পরিণত করা সম্ভব নয়। এটা জাতির জন্য আরেকটি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে বলেই আমার মনে হয়। ভারত ছাড়া পৃথিবীতে কোন ভাষার নামে বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে এমনটি আমাদের জানা নেই। একটি ভাষার নামে বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার বিষয়টি কিছুটা অদ্ভুতও বটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ও কনসেপ্টের সাথে এটা সংগতিপূর্ণ নয়। বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল বিশ্বজনীন। জ্ঞান জগতের অসংখ্য প্রয়োজনীয় বিষয়, বিভিন্ন ভাষা সেখানে শেখানো হবে। নিছক একটি ভাষা শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে পারে না, ভাষা বিদ্যালয় হ'তে পারে। বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়, ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়, উর্দূ বিশ্ববিদ্যালয়, ফার্সী বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি কেউ কোন দিন শুনেছেন? শুনেননি। তাহ'লে আরাবী বিশ্ববিদ্যালয় কেন? এর যৌক্তিক ভিত্তি কি?

ইসলাম শুধু আরাবী ভাষার সাথে সম্পৃক্ত কোন ধর্ম নয়। বরং ইসলাম সার্বজনীন ও সর্বকালীন। আমরা ইসলামের মহান ও কালজয়ী মতাদর্শ জাতিকে শিখাতে চাই। যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে একজন মানুষ মনুষ্যত্বের উচ্চতর শিখরে আরোহণ করতে পারবে, দক্ষ ও উন্নত সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে পারবে, দেশ ও জাতির উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারবে এবং ইসলাম শিখতে গিয়ে প্রয়োজন মাফিক যে আরাবী ভাষা শিখতে হবে, সে ব্যবস্থাও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবে। বর্তমান পৃথিবীতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কনসেপ্ট ডেভেলপ করেছে, তাতে আরবীর পাশাপাশি অন্যান্য ভাষা এবং আধুনিক বিদ্যাও শিক্ষা দেয়া হয়। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখা সেখানে রয়েছে। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে এ ধরনের সকল বিদ্যা শিক্ষা করা সময়ের অপরিহার্য দাবীও বটে।

সুতরাং ফাযিলকে ডিগ্রী এবং কামিলকে মাস্টার্স ডিগ্রীর মান প্রদানের জোরালো দাবী জানাই। এ জন্য মালয়েশিয়া, পাকিস্তান ও অন্যান্য মুসলিম দেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে ঢাকায় এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন একটি স্বতন্ত্র 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' চাই। কিন্তু 'ইসলামী আরাবী বিশ্ববিদ্যালয়' নয়।

ছাহাবা চরিত

বিলাল বিন রাবাহ (রাঃ)

মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমতঃ

দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের পর বিলাল (রাঃ) নতুন জীবন ফিরে পেলেন। বাধাহীন ভাবে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হ'লেন ইসলামের যাবতীয় বিধান প্রতিপালনে। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সর্বতো খেদমতে। সুখ-দুঃখ, সফর-মুক্বীম, ওয়ায ও তাবলীগের মজলিসে অথবা যুদ্ধের ময়দানে সর্বত্র তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে হাযির থাকতেন। বিলাল (রাঃ) সহ অপরাপর দরিদ্র, পূর্বে ক্রীতদাস ছিল এমন নও মুসলিমগণ, যারা সার্বক্ষণিক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ঘিরে থাকতেন, তাদের প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন,

وَلاَتَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِىِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَىْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ-

'আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাবও বিন্দুমাত্র তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। এতে আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন' *(আন'আম ৫২)*।

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, ওত্ববা, শায়বা, ইবনে রবী'আ, মুত্ব'ইম ইবনে আদী, হারেছ ইবনে নওফেল প্রমুখ কতিপয় কোরাইশ সর্দার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচা আবু তালিব-এর নিকট এসে বলল, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদের কথা মেনে নিতে আমাদের সামনে একটি বাধা এই যে, তার চারপাশে সর্বদা এমন সব লোকের ভীড় লেগে থাকে, যারা হয় আমাদের ক্রীতদাস ছিল, না হয় আমাদেরই দান-দক্ষিণায় লালিত-পালিত হ'ত। এমন নিকৃষ্ট লোকদের উপস্থিতিতে আমরা তার মজলিসে যোগদান করতে পারিনা। আপনি তাকে বলে দিন, যদি সে আমাদের আসার সময় তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দেয়, তবে আমরা তার কথা নিয়ে বিবেচনা করতে সম্মত রয়েছি।

আবু তালেব মহানবী (ছাঃ)-কে তাদের বক্তব্য জানিয়ে দিলে ওমর ফারূক (রাঃ) মত প্রকাশ করে বলেন, এতে অসুবিধা কি? আপনি কিছুদিন তাই করে দেখুন। এরা তো অকপট বন্ধুবর্গই। কোরাইশ সরদারদের আগমনের সময় এরা না হয় সরেই যাবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। আয়াতে উল্লিখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে।[১] অন্য বর্ণনায় আছে, তাদের কথা মত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাগজ আনতে বলেন এবং সনদ লিখার জন্য আলী (রাঃ) -কে ডেকে পাঠান। সে সময়ে এই দুর্বল মুসলমানগণ এক কোণে বসেছিলেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) আলী (রাঃ) -এর হাত থেকে কাগজ নিয়ে ছুড়ে ফেলে দেন এবং ঐ দুর্বল মুমিনগণের কাছে ডেকে আনেন।[২]

যাদের সম্পর্কে আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে তাঁরা হ'লেন, বিলাল হাবশী (রাঃ), ছোহায়েব রূমী (রাঃ), আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ), আবু হুযায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম (রাঃ), উমায়েদের মুক্ত ক্রীতদাস ছবীহ (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ), মিকদাদ ইবনে আমর (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবায়ে কেরাম।[৩]

মদীনায় হিজরতঃ

নববী ১৩ বছর। মুসলমানদের উপরে মক্কাবাসী পৌত্তলিকদের অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা চরমে পৌঁছলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হিজরতের নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশে অপরাপর ছাহাবীগণের ন্যায় হযরত বিলাল (রাঃ)ও মদীনায় হিজরত করেন এবং সা'দ বিন গাইসুমা আনছারীর মেহমান হন। মহানবী (ছাঃ) মদীনায় শুভাগমনের পর আনছার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে দেন। এ সময়ে বিলাল বিন রাবাহ (রাঃ)-কে তিনি আবু রবীহা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান গায়ছামী আনছারীর মুসলিম ভাই বানিয়ে দেন। তাদের দু'জনের মধ্যে দৃষ্টান্তমূলক সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়েছিল। বিলাল (রাঃ) কখনো বাইরে গেলে স্বীয় দ্বীনী ভাই আবূ রবীহার নিকট তাঁর সকল কাজের দায়িত্ব অর্পন করে যেতেন।[৪]

জিহাদে অংশগ্রহণঃ

মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরেই কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদী দামামা বেজে উঠল। জিহাদের অনুমতি প্রদান করে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করলেন,

---

১. *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত), পৃঃ ৩৮১-৮২; তাফসীরে ইবনু কাছীর, অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান (ঢাকাঃ তাফসীর পাবলিকেশন্স কমিটি, ২য় সংস্করণ মে১৯৯৬), ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৫০-৫১; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১/৩৫৩ পৃঃ।*

২. *বঙ্গানুবাদ ইবনু কাছীর, ৮/৫১ পৃঃ।*

৩. *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮২।*

৪. *সিয়ার ১/৩৫৮; বিশ্বনবীর সাহাবী, পৃঃ ৩৫।*

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ-

'যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হ'ল তাদেরকে, যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে। কেননা তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম' *(হজ্জ ৩৯)*। একই সূরার শেষাংশে আল্লাহ বলেন,

وَجَاهِدُوْا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ-

'তোমরা আল্লাহ্র জন্য প্রকৃতভাবে জিহাদ কর। তিনি তোমাদের পসন্দ করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি' *(হজ্জ ৭৮)*।

২য় হিজরীর ১৭ রামাযান সংঘটিত হ'ল ইসলামের মোড় পরিবর্তনকারী প্রথম যুদ্ধ 'বদর'। অতঃপর ওহোদ, খন্দক, খায়বার, তাবূক, মূতা, হুনাইন প্রভৃতি যুদ্ধ সমূহের মাধ্যমে ইসলামের সর্বব্যাপী প্রসার ও গ্রহণযোগ্যতা ছড়িয়ে পড়ল। যে সকল অকুতোভয় বীর সিপাহসালার জীবনপণ জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের সর্বব্যাপী বিজয় সুনিশ্চিত হয়েছিল হযরত বিলাল (রাঃ) তাদের অন্যতম ছিলেন। বদর সহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত সকল যুদ্ধেই তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।[৫] বদর যুদ্ধে তিনি স্বীয় কাফের মনিব, যে তাঁর উপরে চালিয়েছিল বিশ্ব ইতিহাসের বর্বরোচিত নির্যাতন, সেই কুখ্যাত উমাইয়া বিন খালফকে হত্যা করেছিলেন।[৬] অন্য বর্ণনা মতে বদর প্রান্তরে উমাইয়াকে দেখে বিলাল (রাঃ)-এর পূর্ব স্মৃতি মনে পড়ে গেল। তিনি ছাহাবায়ে কেরামকে ইসলামের চির দুশমন উমাইয়ার প্রতি ইঙ্গিত করলে তাঁরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাকে হত্যা করেন।[৭] এতদ্ব্যতীত খলীফা ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলে বিলাল (রাঃ) সিরিয়া গমন করেন এবং রোমকদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন।[৮]

মুওয়াযযিন বিলালঃ

বিলাল (রাঃ)-এর সুমিষ্ট, আবেগময়, হৃদয়গ্রাহী, সুললিত কণ্ঠস্বর সমকালীন সকল মুহাজির ও আনছার ছাহাবীগণকে বিস্ময়াভিভূত করেছিল। আর এ অনন্য গুণটিই তাঁকে এনে দিয়েছিল ইসলামের প্রথম মুওয়াযযিন[৯] হওয়ার গৌবরধন্য খেতাব। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল খুবই উঁচু ও শক্তিশালী। অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশে তিনি কা'বা ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে আযান দিয়েছিলেন।[১০] সেদিনের তাঁর আযানের মনমুগ্ধকর ধ্বনি সমবেত সকলে পিন পতন নিরবতায় শ্রবণ করেছিল। মক্কার আকাশে সেদিন নেমে এসেছিল নিস্তব্ধতার ছায়া।

হযরত বিলাল (রাঃ) মসজিদে নববীর নিয়মিত মুওয়াযযিন ছিলেন। রামাযান মাসে তিনি সাহারীর আযান দিতেন এবং অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন ফজরের আযান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বিলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[১১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তিকালের পর আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে অতঃপর ওমর (রাঃ)-এর আমলেও তিনি আযান দিয়েছেন। একবার সিরিয়ার অভিযানে গিয়ে খলীফা ওমর (রাঃ)-এর অনুরোধে তিনি একদা আযান দিয়েছিলেন। তাঁর হৃদয়গ্রাহী আযান শ্রবণে ছাহাবায়ে কেরামের মন বিগলিত হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগের স্মৃতি সব ভেসে উঠায় সকলে কাঁদতে লাগেন। যায়েদ বিন আসলাম স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

قَدِمْنَا الشَّامَ مَعَ عُمَرَ فَأَذَّنَ بِلاَلٌ فَذَكَرَ النَّاسُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَرَ يَوْمًا أَكْثَرَ بَاكِيًا مِنْهُ-

'আমরা হযরত ওমর (রাঃ)-এর সাথে সিরিয়ায় গমন করলাম। অতঃপর বিলাল আযান দিলেন। (তার আযান শ্রবণে) লোকদের রাসূল (ছাঃ)-এর কথা স্মরণ হয়ে গেল। আমি লোকদেরকে সেদিনের ন্যায় আর কখনো এত অধিক কাঁদতে দেখিনি'।[১২]

ফযীলতঃ

হযরত বিলাল (রাঃ)-এর অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম প্রধান দিকগুলি হ'ল ইসলামের প্রতি তাঁর অগ্রগামিতা, মুছীবতে ধৈর্যধারণ করা ও আল্লাহ তা'আলার প্রতি দৃঢ় ঈমান, রাসূলপ্রীতি, জিহাদী তামান্না প্রভৃতি। অবর্ণনীয় নির্যাতনের মুখেও তিনি যেভাবে তাওহীদী ঝাণ্ডাকে বুকে ধারণ করে ছিলেন, তেমনি জিহাদের প্রতি তাঁর অনুরাগও ছিল সর্বাধিক। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন ছিলেন আমানতদার, তেমনি পরহেযগারীতারও শীর্ষস্থান দখলে সমর্থ হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ(ছাঃ)-এর খেদমতে যেমন ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ, তেমনি মুওয়াযযিন হিসাবে ছিলেন দায়িত্ব সচেতন। তাক্বওয়া বা আল্লাহ ভীতিই তার জীবনের আমূল পরিবর্তনের একমাত্র সোপান ছিল। জীবনের একটি বিরাট অধ্যায়ে ক্রীতদাস থেকেও তিনি লাভ করেছিলেন ছাহাবায়ে কেরামের অকৃত্রিম ভালবাসা।

---

৫. মুনতাযাম ৪/২৯৯; তাহযীবু আসমাইল লুগাত, ১/১৩৬ পৃঃ।
৬. তাহযীবু আসমাইল লুগাত ১/১৩৬; উসদুল গাবাহ ১/২৩৭।
৭. বিশ্ব নবীর সাহাবী, ৩/৩৫।
৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭; উসদুল গাবাহ ১/২৩৮ পৃঃ।
৯. সিয়ার ১/৩৪৯; তাহযীবু আসমাইল লুগাত ১/১৩৬; উসদুল গাবাহ ১/২৩৭।
১০. মুনতাযাম ৪/২৯৯; সিয়ার ১/৩৫৬।
১১. বুখারী, মুসলিম, নায়লুল আওত্বার ২/১২০ পৃঃ।
১২. সিয়ার ১/৩৫৭।

হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

كَانَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ اَبُوْبَكْرٍ سَيِّدُنَا وَاَعْتَقَ سَيِّدَنَا-

'ওমর (রাঃ) বলতেন, আবু বকর আমাদের সরদার এবং তিনি আমাদের সরদারকে মুক্ত করেছেন। অর্থাৎ বিলালকে মুক্ত করেছেন'।[১৩]

তাঁর ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 'একদা ফজরের ছালাতের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিলালকে বললেন, ইসলামের মধ্যে উপকারী ও আশাব্যঞ্জক এমন কি আমল তুমি করেছ? কেননা রাতে জান্নাতে আমি আমার সামনে তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। বিলাল বললেন, আমার নিকটে আশাব্যঞ্জক আমল হচ্ছে দিবা-রাত্রি যখনই আমি পবিত্রতা অর্জন করি, তখনই ছালাত আদায় করি, যা আল্লাহ পাক আমার তাক্বদীরে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন'।[১৪] অন্য বর্ণনায় বিলাল যখনই ওযূ করতেন তখনই দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন উল্লেখ আছে'।[১৫]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

رَأَيْتُنِىْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ وَسَمِعْتُ خَشْفًا أَمَامِىْ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا يَاجِبْرِيْلُ، فَقَالَ هَذَا بِلاَلٌ-

'আমি দেখলাম যে, আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি এবং আমার সামনে কারো হাটার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তখন আমি জিবরীলকে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? জিবরীল বলল, এ হচ্ছে বিলাল'।[১৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

نِعْمَ الْمَرْءُ بِلاَلٌ وَهُوَ سَيِّدُ الْمُؤَذِّنِيْنَ

'কতইনা উত্তম ব্যক্তি বিলাল। সে মুওয়াযযিনদের সরদার'।[১৭]

ইলমে হাদীছে অবদানঃ

ইলমে হাদীছেও বিলাল (রাঃ) অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাঁর নিকট থেকে ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের একটি বিরাট জামা'আত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে উল্লেখযোগ্যগণ হ'লেন আবুবকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), আলী (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), উসামাহ বিন যায়েদ (রাঃ), কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ), আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ), বারা ইবনে আযেব (রাঃ), জাবের (রাঃ), সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রাঃ) প্রমুখ।[১৮]

মৃত্যু ও দাফনঃ

তাঁর মৃত্যু ও দাফন সম্পর্কে জীবনীকারগণ একাধিক মত পেশ করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তায়মী, ইবনু ইসহাক, আবু ওমর আয-যারীর সহ একটি জামা'আতের মতে তিনি ২০ হিজরীতে সিরিয়ায় ইন্তেকাল করেছেন। কেউ কেউ তার মৃত্যু সন ২১ হিজরী উল্লেখ করেছেন। তবে ২০ হিজরীর মতটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ওয়াক্বেদীর মতে তাকে 'বাবুছ ছাগীরে' দাফন করা হয়েছে। আলী ইবনু আব্দুল্লাহ আত-তামীমীর মতে 'বাবু কায়সানে' তাকে দাফন করা হয়েছে। অপর এক দলের মতে তিনি 'হালবে' ইন্তেকাল করেছেন এবং 'বাবুল আরবাঈনে' তাকে দাফন করা হয়েছে।[১৯]

উপসংহারঃ

মহানবী (ছাঃ)-এর সম্মানিত ছাহাবীগণের বৈচিত্র্যময় জীবন মুমিন মাত্রের জন্যই উপদেশ, দৃষ্টান্ত, প্রেরণা ও দিক-নির্দেশনায় ভরপুর। তাওহীদ ও সুন্নাতের সকল শাখায় তাদের সক্রিয় পদচারণা সর্বোপরি পরহেযগারিতার শীর্ষ চূড়ায় উত্তীর্ণের ফলেই তারা এ সম্মান লাভে ধন্য হয়েছিলেন। বিশ্ব ইতিহাসের ন্যক্কারজনক বঞ্চনা, বর্বরোচিত নির্যাতন, অপরিমাণ লাঞ্ছনা তাঁদেরকে চির সত্য, শাশ্বত দ্বীন 'ইসলাম' থেকে অণু পরিমাণও পদস্খলন ঘটাতে পারেনি। আজকের দিনেও যদি কোন মুমিন তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নিঃসন্দেহে তারাও পরকালে মহা সম্মানিত হবেন ইনশাআল্লাহ। কেননা রাসূলূল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

...تَفْتَرِقُ أُمَّتِىْ عَلَى ثَلاَثٍ وَ سَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِىْ-

'...আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। প্রত্যেক দলই জাহান্নামে যাবে একটি দল ব্যতীত। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, আমি এবং আমার ছাহাবীগণ যার উপরে আছি'।[২০] আল্লাহ পাক আমাদেরকে ছাহাবীগণের জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে জান্নাতের চিরন্তন পথে অগ্রগামী হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন।

---

১৩. *বঙ্গানুবাদ ছহীহ বুখারী (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনি, এপ্রিল ১৯৯৭) ৩//৫৬৩, 'মানাক্বেব' অধ্যায় হা/৩৪৭১।*
১৪. *মুসলিম (দিল্লী ছাপাঃ) ২য় খণ্ড পৃঃ ২৯২ 'বিলালের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ।*
১৫. *হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/২০২ হা/৪৯৪।*
১৬. *হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/২০২ পৃঃ, হা/৪৯৩।*
১৭. *হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/১৯৯, হা/৪৮৫ মুসদাদরাক ৩/২৮৫ পৃঃ।*
১৮. *তাহযীবু আসমাইল লুগাত, ১/১৩৬-১৩৭; সিয়ার ১/৩৫১।*
১৯. *সিয়ার ১/৩৫৯-৬০ পৃঃ।*
২০. *আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/২১২৯; ঐ সিলসিলা ছহীহা হা/১৩৪৮ সনদ হাসান।*

দিশারী

কতিপয় অপপ্রচারের জবাব

মুযাফফর বিন মুহসিন

বিশ্ব ইতিহাসে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা একটি নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম। অসংখ্য ভ্রান্ত পথ ও মতের মাঝে ঐতিহাসিক এ আন্দোলন চির সত্যের ঝাণ্ডাবাহী আলোকস্তম্ভ স্বরূপ। তাই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র উপর ভিত্তিশীল এ আন্দোলন যুগ যুগ ধরে নির্ভেজাল সত্যের পথে মানুষকে আহ্বান জানিয়ে আসছে। এ আন্দোলন সর্বযুগেই বিভিন্ন বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে সম্মুখপানে। তবে কখনো সে গতি মন্থর হয়েছে কখনো হয়েছে বেগবান।

বর্তমানে 'আন্দোলন'-এর ক্ষুরধার লেখনী, ওজস্বিনী ভাষণ ও জ্ঞানগর্ভ প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম সমূহের মাধ্যমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর স্রোত যখন বাংলাদেশে উত্তাল তরঙ্গমালার ন্যায় বহমান, যখন শিরক ও বিদ'আতের আড্ডাখানা গুলিতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দীপ্ত প্রদীপ জ্বলতে শুরু করেছে, তখন দিশাহারা স্বার্থান্বেষী মহলগুলির জন্য এ আন্দোলন হয়েছে পথের কাঁটা। তারা তাদের সর্বস্ব নিয়ে এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে। ধর্মীয় জালসার নামে আহলেহাদীছ-এর বিরুদ্ধে গীবত-তোহমতের হলাহল পরিবেশন করছে ও জনগণকে উত্তেজিত করে তুলছে। বিভিন্ন বই-পুস্তক, লিফলেট ও হ্যাণ্ডবিলের মাধ্যমে তারা মনগড়া সব মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত তথ্যসমূহ পরিবেশন করে সমাজে প্রচলিত বিভ্রান্তিসমূহকে স্থায়ী রাখার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

এরকমই মিথ্যা তথ্যে ভরপুর কিছু অপপ্রচার মূলক লেখনী সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হয়েছে। যেমন- (১) ময়মনসিংহ হ'তে জানুয়ারী ২০০৪-য়ে প্রকাশিত জনৈক মুফতী আহমদ আলী রচিত 'আহলে সুন্নাত বনাম আহলে হাদীস' (২) মার্চ মাসে চট্টগ্রাম হাটহাজারী থেকে প্রকাশিত মাওলানা মুমতাজুল করিম রচিত 'মাযহাবের গুরুত্ব ও আহলে হাদিস সম্প্রদায়' এবং (৩) এপ্রিলে ঢাকার মুফতী আব্দুর রহমানের তত্ত্বাবধানে মুফতী রফিকুল ইসলাম সংকলিত ও জামালপুর হ'তে প্রকাশিত 'তথাকথিত আহলে হাদীসের আসল রূপ' (বাতিল প্রতিরোধ সিরিজ-১) (৪) কুমিল্লা হ'তে ৪৪ দফা চ্যালেঞ্জ সম্বলিত লিফলেট এবং (৫) ঢাকা রাজারবাগ-এর মাসিক আল-বাইয়্যেনাত-এর বিভ্রান্তিকর মিথ্যা ফৎওয়া সম্বলিত লিফলেট।

লেখনীগুলি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হ'তে প্রকাশিত হ'লেও সবগুলির মর্মার্থ একই। এর মাধ্যমে তারা যেমন কুরআন-হাদীছের অনুবাদের নামে প্রতিবাদ এবং ব্যাখ্যার নামে অপব্যাখ্যা করে সীমাহীন ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়েছেন। জগদ্বিখ্যাত মনীষীগণের কিছু উক্তির অনুবাদের ক্ষেত্রে যেমন তারা ছুরি চালিয়েছেন, তেমনি মনীষীগণ যাদেরকে সম্বোধন করে উক্তিগুলির অবতারণা করেছেন, তাদেরকে আড়ালে রেখে সেগুলি আহলেহাদীছের বিরুদ্ধে অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করেছেন। এরূপ আত্মঘাতী প্রতারণা বিশ্ব ইতিহাসে অনেকটাই নযীরবিহীন। উপরোক্ত লেখনীগুলি হ'তে নোংরা গালিগালাজ ও গীবত-তোহমতগুলো অনুল্লেখিত রেখে বাকী উল্লেখযোগ্য কিছু বক্তব্য ও তার জবাব সুধী পাঠকবৃন্দের উদ্দেশ্যে এখানে তুলে ধরা হ'ল।-

একঃ ১২৪৬ হিজরীতে ভারতবর্ষে আহলেহাদীছগণের জন্ম। 'আহলেহাদীছ' নাম ইংরেজদের বরাদ্দকৃত। সুতরাং যত বুলি আওড়াক তারা বাতিলের উপর আছে। তারা যা আমল করে তা কুরআন-সুন্নাহ্র বিরোধী। ৭৩ দলের মধ্যে যে দল নাজাতপ্রাপ্ত, বর্তমানে সে দল হানাফী মাযহাবের অনুসারী। আর এর যারা বিরোধী তারাই বিদ'আতী ও জাহান্নামী *(সার সংক্ষেপঃ তথাকথিত আহলেহাদীসের আসল রূপ, পৃঃ ২১; আহলে সুন্নাত বনাম আহলে হাদীস, পৃঃ ২ ও ১৮)।*

জবাবঃ 'আহলেহাদীছ' সম্পর্কে উপরোক্ত ভুল ও মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে তারা দুঃখজনকভাবে নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। নইলে স্বয়ং ছাহাবায়ে কেরামই যেখানে 'আহলুল হাদীছ' নামে পরিচিত, সেখানে এমন চির সত্য বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দুর্মতি তাদের কখনো হ'তো না।

(১) প্রখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) (মৃঃ ৭৪ হিঃ) মুসলিম যুবকদের দেখলে খুশী হয়ে বলতেন,

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى الشَّبَابَ قَالَ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُوَسِّعَ لَكُمْ فِى الْمَجْلِسِ وَأَنْ نُفَهِّمَكُمُ الْحَدِيْثَ فَإِنَّكُمْ خُلُوْفُنَا وَأَهْلُ الْحَدِيْثِ بَعْدَنَا-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাকে 'মারহাবা' জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করার ও তোমাদেরকে হাদীছ বুঝাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী 'আহলেহাদীছ'।[১]

(২) খ্যাতনামা তাবেঈ ইমাম শা'বী *(২২-১০৪ হিঃ)* ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আতকে 'আহলুল হাদীছ' বলতেন। যেমন একদা তিনি বলেন,

---

১, আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ (লাহোরঃ রিপন প্রেস, তারিখ বিহীন) পৃঃ ১২; হাকেম একে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। -আল-মুস্তাদরাক ১/৮৮ পৃঃ, হা/২৯৮; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮০।

لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا حَدَّثْتُ إِلاَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَدِيْثِ -

'এখন যেসব ঘটছে, তা আগে জানলে আমি কোন হাদীছ বর্ণনা করতাম না, কেবল ঐ হাদীছ ব্যতীত, যার উপরে 'আহলুল হাদীছগণ' অর্থাৎ ছাহাবায়ে কেরাম একমত হয়েছেন'।[২]

(৩) উপমহাদেশের খ্যাতনামা বিপ্লবী সংস্কারক শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬হিঃ/১৭০৩-১৭৬২খৃঃ) প্রায় তার একশ' বছর পূর্বেই আহলেহাদীছের কথা উল্লেখ করে স্বীয় জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লা-হিল বালিগাহ'-তে 'আহলুল হাদীছ ও আছহাবুর রায়-এর মধ্যকার পার্থক্য' শিরোনামে অধ্যায় রচনা করে উভয়েরই পরিচয় বর্ণনা করেছেন।[৩] যদি ১২৪৬ হিজরী মোতাবেক ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ কর্তৃক আহলেহাদীছ-এর জন্ম হ'ত, তাহ'লে শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ) আহলেহাদীছদের নিয়ে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে অধ্যায় রচনার কোন কারণ ছিল না।

তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং পরবর্তী যুগের সকল মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম যেমন এ নামেই পরিচিত ছিলেন, তেমনি আম জনসাধারণও এ নামেই পরিচিত ছিল। বস্তুতঃ ছাহাবায়ে কেরামই আহলেহাদীছ জামা'আতের প্রথম কাতারের মানুষ এবং তারপর থেকে শুধু ভারতবর্ষেই নয়, গোটা বিশ্বেই তারা তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নাম সমূহে পরিচিত হয়ে আসছেন।

(৪) হাদীছে বর্ণিত নাজাতপ্রাপ্ত ও সাহায্যপ্রাপ্ত দল কোন্‌টি এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ)-এর উস্তায আলী ইবনুল মাদীনী (১৬১-২৩৪ হিঃ) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন,

هُمْ أَهْلُ الْحَدِيْثِ وَالَّذِيْنَ يَتَعَاهَدُوْنَ مَذَاهِبَ الرَّسُوْلِ وَيَذُبُّوْنَ عَنِ الْعِلْمِ لَوْلاَهُمْ لَمْ نَجِدْ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّافِضَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَأَهْلِ الْإِرْجَاءِ وَالرَّأْيِ شَيْئًا مِنَ السُّنَنِ-

'তারা হ'ল 'আহলুল হাদীছ' জামা'আত। যারা রাসূলের বিধানসমূহের হেফাযত করে এবং ইল্‌ম তথা কুরআন-হাদীছের পক্ষে প্রতিরোধ করে। তারা ব্যতীত মু'তাযিলা রাফেযী (শী'আ), জাহমিয়া, মুরজিয়া ও আহলুর রায়-দের নিকট থেকে আমরা সুন্নাতের কিছুই আশা করতে পারি না'।[৪]

(৫) ইমাম আবুদাঊদ (২০২-২৭৫হিঃ) বলেন, لَوْلاَ هَذِهِ الْعِصَابَةُ لاَنْدَرَسَ الْإِسْلاَمُ يَعْنِىْ أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ

'আহলেহাদীছ জামা'আত যদি দুনিয়ায় না থাকত, তাহলে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত'।[৫]

(৬) ইয়াযীদ ইবনু হারূণ (১১৮-২১৭হিঃ) ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (১৬৪-২৪১হিঃ) বলেন, إِنْ لَمْ يَكُوْنُوْا أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ فَلاَ أَدْرِىْ مَنْ هُمْ؟ 'তারা যদি আহলেহাদীছ না হয় তবে আমি জানিনা তারা কারা'।[৬]

(৭) মুহাদ্দিছ খত্বীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩হিঃ) অন্যান্যদের সাথে আহলেহাদীছদের পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وَكُلُّ فِئَةٍ تَتَحَيَّزُ إِلَى هَوَاى تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَوْ تَسْتَحْسِنُ رَأْيًا تَعْكُفُ عَلَيْهِ سِوَى أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ فَإِنَّ الْكِتَابَ عُدَّتُهُمْ وَالسُّنَّةُ حُجَّتُهُمْ وَالرَّسُوْلُ فِئَتُهُمْ وَإِلَيْهِ نِسْبَتُهُمْ لاَيَعْرِجُوْنَ عَلَى الْأَهْوَاءِ وَلاَيَلْتَفِتُوْنَ إِلَى الْآرَاءِ-

'প্রত্যেক দলই প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ও তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে অথবা রায় বা নিজস্ব অভিমতকে উত্তম মনে করে এবং তার উপরই অটল থাকে; কেবল আহলেহাদীছগণ ছাড়া। কারণ আল-কুরআন তাদের হাতিয়ার, সুন্নাহ তাদের দলীল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের দলনেতা এবং তাঁর দিকেই তাদের সম্বন্ধ। তারা মনোবৃত্তির উপর বিচরণ করে না এবং রায়ের দিকেও ভ্রুক্ষেপ করে না'।[৭]

(৮) যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন,

فَأَهْلُ الْحَدِيْثِ حَشَرَنَا اللّٰهُ مَعَهُمْ لاَ يَتَعَصَّبُوْنَ لِقَوْلِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ مَهْمَا عَلاَ وَسَمَا حَاشَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلاَفِ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لاَيَنْتَمِىْ إِلَى الْحَدِيْثِ وَالْعَمَلِ بِهِ فَإِنَّهُمْ يَتَعَصَّبُوْنَ لِأَقْوَالِ أَئِمَّتِهِمْ وَقَدْ نَهَوْهُمْ عَنْ ذٰلِكَ كَمَا يَتَعَصَّبُ أَهْلُ الْحَدِيْثِ لِأَقْوَالِ نَبِيِّهِمْ -

'আহলেহাদীছগণ (আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাদের সাথে একত্রিত করুন!) হ'লেন তাঁরাই, যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির রায়কে প্রাধান্য দেন না, যত বড়ই তিনি হউন না কেন। তারা তাদের বিরোধী, যারা হাদীছ ও তার প্রতি আমলের তোয়াক্কা করে না, তারা

২. শামসুদ্দীন যাহাবী, তাযকেরাতুল হুফফায (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ১/৮৩ পৃঃ।
৩. দ্রঃ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (আরবী-উর্দূ) (দেউবন্দঃ মাকতাবায়ে থানভী, ১৯৮৬) ১/৩৫৬ পৃঃ।
৪. খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ (কায়রোঃ মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়াহ, প্রথম প্রকাশঃ ১৪১৭হিঃ/১৯৯৬খৃঃ), পৃঃ ৩০ হা/৯, সনদ ছহীহ।
৫. শারফ ২৯ পৃঃ।
৬. প্রাগুক্ত, হা/৪১ ও ৪৩, পৃঃ ৫৯ ও ৬১; সনদ ছহীহ, দ্রঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫ খৃঃ/১৪০৫হিঃ), ১/৪৭৮-৪৮১ পৃঃ, হা/২৭০-এর ব্যাখ্যা।
৭. আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ২৮।

যেমন কেবল তাদের ইমামদের রায়কে প্রাধান্য দেয়- অথচ তাদের ইমামগণ এ থেকে নিষেধ করে গেছেন, তেমনি আহলেহাদীছগণ একমাত্র তাদের নবীর কথাকে প্রাধান্য দেন'।

অতঃপর তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলেন,

فَلاَ عَجَبَ بَعْدَ هَذَا الْبَيَانِ أَنْ يَّكُوْنَ أَهْلُ الْحَدِيْثِ هُمُ الطَّائِفَةُ الظَّاهِرَةُ وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ بَلْ وَالْأُمَّةُ الْوَسَطُ الشُّهَدَاءُ عَلَى الْخَلْقِ-

'এই বর্ণনার পর আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, আহলেহাদীছরাই সেই বিজয়ী কাফেলা এবং নাজাতপ্রাপ্ত দল; বরং মধ্যমপন্থী উম্মত, যারা মানবজাতির উপর হবে সাক্ষী স্বরূপ'।[৮] নিঃসন্দেহে 'আহলেহাদীছ'-এর প্রকৃত পরিচয় তার নির্ভেজাল আক্বীদা ও আমলের মধ্যে নিহিত। তার পিতৃ পরিচয়, বিদ্যা-বুদ্ধি, অর্থ-সম্পদ বা সামাজিক পদমর্যাদার মধ্যে নয়।

জ্ঞাতব্যঃ কেউ কেউ 'আহলেহাদীছ' দ্বারা শুধু মুহাদ্দিছগণকে বুঝতে চান। পরিভাষাগত দিক থেকে বিষয়টি অনুরূপ হ'লেও আম জনসাধারণকে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের যথার্থ অনুসারী বা মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণকারী হিসাবে 'আহলেহাদীছ' বলা যাবে না এমনটি নয়। বরং যুগে যুগে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারীগণ 'আহলেহাদীছ' নামেই পরিচিত হয়েছেন। জগদ্বিখ্যাত মনীষী ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ)-এর গবেষণালব্ধ বক্তব্যটি এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

وَ أَهْلُ السُّنَّةِ الَّذِيْنَ نَذْكُرُهُمْ أَهْلُ الْحَقِّ وَ مَنْ عَدَاهُمْ فَأَهْلُ الْبَاطِلِ فَإِنَّهُمُ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ كُلُّ مَنْ سَلَكَ نَهْجَهُمْ مِنْ خِيَارِ التَّابِعِيْنَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَهْلُ الْحَدِيْثِ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ مِّنَ الْفُقَهَاءِ جِيْلاً فَجِيْلاً إِلَى يَوْمِنَا هَذَا وَ مَنِ اقْتَدَى بِهِمْ مِنَ الْعَوَامِ فِيْ شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ-

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত- যাদেরকে আমরা হক্বপন্থী ও তাদের বিরোধী পক্ষকে বাতিলপন্থী বলেছি, তাঁরা হ'লেন (ক) ছাহাবায়ে কেরাম (খ) তাঁদের অনুসারী শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণ (গ) আহলেহাদীছগণ (ঘ) ফক্বীহদের মধ্যে যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত (ঙ) এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐ সকল 'আম জনসাধারণ, যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন'।[৯]

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, ছাহাবায়ে কেরাম হ'লেন প্রথম সারির আহলেহাদীছ জামা'আত, অতঃপর মুহাদ্দিছগণ অতঃপর কুরআন-সুন্নাহ্র নিঃশর্ত আমলকারী সকল যুগের আম জনসাধারণ।

দুইঃ হাদীছ সংকলনের সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত হাদীছ, তাফসীর, ফিক্বহ এবং হাদীছের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থগুলি যাদের মাধ্যমে রচিত হয়েছে তাদের সকলেই যেকোন ইমামের মুক্বাল্লিদ ছিলেন। হাদীছগ্রন্থের বিশিষ্ট ছয় ইমামসহ অন্যান্য ইমাম এবং বিভিন্ন সময়ে বড় বড় গ্রন্থ প্রণেতা সবাই কোন না কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। সুতরাং মাযহাবপন্থীরাই সত্যের পথে আছে *(সার সংক্ষেপঃ তথাকথিত আহলে হাদীসের আসলরূপ, পৃঃ ২৫-২৬; আহলে সুন্নাত বনাম আহলে হাদীস, পৃঃ ২)।*

জবাবঃ আলোচ্য বক্তব্যটি চরম অজ্ঞতার পরিচায়ক এবং নিছক প্রচলিত ধারণা-প্রসূত। কেননা কোন মুহাদ্দিছ কখনো মুক্বাল্লিদ না। আর কোন মুক্বাল্লিদ কখনো মুহাদ্দিছ নন। দু'টি পরস্পর বিরোধী। মুক্বাল্লিদগণের মধ্যে যারা মুহাদ্দিছ নামে পরিচিত, তাদের অধিকাংশই হাদীছকে নিজেদের রায়-এর পক্ষে ব্যাখ্যা করার জন্য নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। সুক্ষ্ম পাঠকগণ তা অবগত আছেন। এঁদের অনূদিত অন্ততঃ ছহীহ বুখারীর বঙ্গানুবাদগুলি সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে পাঠ করলেই সব ধরা পড়বে। এক্ষণে কুতুবে সিত্তাহসহ বিগত যুগের স্বনামধন্য মুহাদ্দিছগণ যে প্রচলিত কোন তাক্বলীদী মাযহাবের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না, সেটা নির্ধারণের জন্য সর্বাগ্রে মাযহাব সমূহের উৎপত্তির ইতিহাস জানা আবশ্যক। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৪১ হিঃ) প্রচলিত মাযহাব সমূহের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেন, إِنَّمَا حَدَثَتْ هٰذِهِ الْبِدْعَةُ فِيْ الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْمَذْمُوْمِ 'মূলতঃ এই বিদ'আতের (তাক্বলীদী মাযহাবের) উৎপত্তি হয়েছে ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর নিন্দিত যুগে'।[১০]

ভারত গুরু শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হিঃ) বলেন, اِعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا قَبْلَ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ غَيْرُ مُجْمَعِيْنَ عَلَى التَّقْلِيْدِ لِخَالِصٍ لِمَذْهَبٍ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ- 'জেনে রাখ হে পাঠক! নিশ্চয়ই ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বেকার লোকেরা নির্দিষ্টভাবে কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপর

৮. *সিলসিলা ছহীহাহ ১/৪৮২ পৃঃ হা/২৭০-এর ব্যাখ্যা।*

৯. *আলী ইবনু হাযম, কিতাবুল ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল (বৈরুতঃ মাকতাবা খাইয়াত্ব ১৩২১/১৯০৩) শহরস্তানীর 'মিলাল' সহ ২/১১৩ পৃঃ; কিতাবুল ফিছাল (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ২য় সংস্করণঃ ১৪২০/১৯৯৯) ১/৩৭১ পৃঃ 'ইসলামী ফের্কাসমূহ' অধ্যায়।*

১০. *ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ, ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৯৯৩ খৃঃ/১৪১৪ হিঃ), ২/১৪৫ পৃঃ।*

সংঘবদ্ধ ছিল না'।[১১] অর্থাৎ প্রচলিত তাক্বলীদীমাযহাবগুলি ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর নিন্দিত যুগে সৃষ্টি হয়েছে, পূর্বে নয়। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক প্রশংসিত যুগ হ'ল তিনটি। যেমন তিনি বলেন, خَيْرُ أُمَّتِىْ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، 'সর্বোত্তম উম্মত হ'ল আমার যুগের উম্মত, অতঃপর পরবর্তীদের যুগ, অতঃপর তৎপরবর্তীদের যুগ'।[১২] অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ), ছাহাবা ও তাবেঈনের যুগ, যা দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীতেই শেষ হয়ে গেছে। আর অনুসরণীয় চার ইমামের জন্ম হ'ল যথাক্রমে, ইমাম আবু হানীফা ৮০-১৫০হিঃ, ইমাম মালেক ৯৩-১৭৯হিঃ, ইমাম শাফেঈ ১৫০-২০৪হিঃ এবং ইমাম আহমাদ ১৬৪-২৪১হিঃ।

এক্ষণে মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম উক্ত তাক্বলীদী ফের্কা সমূহের অনুসারী ছিলেন কি-না, তা তাদের যুগ ও জন্ম-মৃত্যুর তারিখ জানলেই পরিষ্কার জানা যায়।

তৃতীয় শতাব্দী হিজরী হ'ল হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের স্বর্ণ যুগ। এ যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ছিলেন ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬হিঃ), ইমাম মুসলিম (২০৪-২৬১), ইমাম আবুদাঊদ (২০২-২৭৫), ইমাম তিরমিযী (২০৯-২৭৯), ইমাম নাসাঈ (২১৫-৩০৩ হিঃ) এবং ইমাম ইবনু মাজাহ (২০৯-২৭৩)। তাঁদের প্রধান ৬টি হাদীছগ্রন্থ সহ আরো কিছু গ্রন্থ সংকলিত হয় এযুগেই।

এতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, প্রচলিত মাযহাবী ফের্কা সমূহ জন্মের শত বর্ষ পূর্বেই বিশ্বসেরা মুহাদ্দিছগণ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁদের পূর্ববর্তীদের যুগের কথা তো আরো স্বতন্ত্র।

সুধী পাঠকবৃন্দ! মাযহাব সৃষ্টির শতবর্ষ পূর্বে যে মহামতি মুহাদ্দিছগণ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, তারা কিরূপে তাদের মৃত্যুর পরে প্রচলিত তাক্বলীদী মাযহাব সমূহের অনুসারী হ'তে পারেন?

মাযহাবী ফের্কার সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত হক্বপন্থী আলেমগণ সর্বদা নিরপেক্ষভাবে কুরআন-সুন্নাহ্র উপরে গবেষণা করে গেছেন। বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী, পরবর্তীতে তাঁর মসনদনশীল বিশ্ববিশ্রুত উস্তাদ শায়খুল ইসলাম মিয়াঁ নাযীর হোসায়েন দেহলভী, শাহ ইসমাঈল শহীদ, ভারত গৌরব নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, বর্তমান বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী মুহাদ্দিছ শায়খ নাছেরুদ্দীন আলবানী প্রমুখের মত বিদ্বানগণ মাযহাবী গৃহে জন্মগ্রহণ করেও তাক্বলীদী ফের্কাবন্দীর বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন ক্ষুরধার লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে।

[চলবে]

১১. হুজ্জাতুল্লা-হিল বালিগাহ (আরবী-উর্দূ), ১/৩৬৮ পৃঃ, '৪র্থ হিজরীর পূর্বের ও পরের লোকদের অবস্থা বর্ণনা' অধ্যায়।

১২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬০১০ 'ছাহাবীদের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ।

আগাম ঘোষণা দিয়ে আহলেহাদীছ মসজিদ দখল

ফরিদপুর ১৪ মে শুক্রবারঃ আগাম ঘোষণা দিয়ে ফরিদপুর যেলার নগরকান্দা উপযেলার লস্করদিয়া ইউনিয়নের গোড়াইল সৈয়দবাড়ির আহলেহাদীছ জামে মসজিদ'টি পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতেই জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছে হানাফী মাযহাবের দাবীদার একদল লোক। মসজিদ দখলকারীরা যেলা প্রশাসক জনাব জালাল আহমাদের সভাপতিত্বে ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত উভয়পক্ষের আপোষ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অবজ্ঞা করে গত ১৪ মে জুম'আর ছালাতের পূর্বক্ষণে এই ন্যক্কারজনক সন্ত্রাসী কার্য চালায়।

বিবরণে প্রকাশ, গোড়াইলের সৈয়দ বাড়ি সহ ২০টি পরিবার আহলেহাদীছের অনুসারী। বছর তিনেক আগে হাফেয সৈয়দ মুহাম্মাদ আলমাসের নেতৃত্বে সৈয়দবাড়ির ওয়াক্ফ জমিতেই প্রতিষ্ঠা করা হয় 'গোড়াইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ'। বছর দেড়েক আগে এ মসজিদ সংলগ্ন জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি মাদরাসা। আহলেহাদীছগণের এ অগ্রগতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে পার্শ্ববর্তী শাকপালদিয়া মাদরাসার মাওলানা লিয়াকতের নেতৃত্বে একদল লোক এলাকায় তৎপর হয়ে ওঠে। তারা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ও মাদরাসা উচ্ছেদের প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়। এ ঘটনা নগরকান্দা থানা পুলিশকে অবহিত করলে মাওলানা লিয়াকতের অনুসারীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ৯ মে তারা গোড়াইল নূরানী দরগাহ মাদরাসায় সমাবেশ ডেকে ১৪ মে শুক্রবার উক্ত মসজিদ ও মাদরাসা দখলের আগাম ঘোষণা দেয়। এ ঘোষণায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে ফরিদপুরের যেলা প্রশাসন আপোষ সীমাংসার উদ্যোগ নেয়। ১২ মে যেলা প্রশাসকের অফিস কক্ষে উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দসহ এক সর্বদলীয় আপোষ বৈঠক হয়। আপোষ বৈঠকে তারা শান্তি-শৃঙ্খলার বৃহত্তর স্বার্থে মসজিদ দখলের পূর্ব ঘোষণা প্রত্যাহার করতে সম্মত হয়। কিন্তু তারপরও ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের উপস্থিতিতেই ১৪ মে শুক্রবার জুম'আর ছালাতের আগে গেরিলা কায়দায় জোরপূর্বক মাওলানা লিয়াকত ও তার অনুসারীরা দখল করে নেয় গোড়াইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ও মাদরাসা। সংখ্যাল্পতার কারণে আহলেহাদীছগণের বাধা, প্রতিরোধ কোন কাজে আসেনি। আশংকা করা হচ্ছে যে, এরপরে তারা আহলেহাদীছগণের ঘর-বাড়িতে হামলা চালিয়ে তাদেরকে এলাকা থেকে উচ্ছেদ করবে।

চাঞ্চল্যকর এ মসজদি দখলের ঘটনায় এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে দারুণ ক্ষোভ ও আতংকের সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষণে প্রশাসন কি ভূমিকা নেয়, সেদিকেই সকলে তাকিয়ে আছে।

[সূত্রঃ দৈনিক ভোরের রানার, ফরিদপুর, ১৯ মে'০৪ বুধবার, ১১তম বর্ষ ১৫৭তম সংখ্যা, ১ম পৃঃ লীড শিরোনাম ১-৬ কলাম ব্যাপী]

[আমরা এই ন্যক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি এবং প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ও কঠোর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা বলতে চাই যে, মাওলানা লিয়াকত ও তাঁর ন্যায় ধর্মীয় শিক্ষিত ভাইগণ যদি তাক্বলীদের অন্ধ গোঁড়ামি ছেড়ে দিয়ে খোলা মনে শুধু ছালাতের বিষয়টিতে ছহীহ হাদীছ যাচাই করতেন, তাহ'লেই গোলমাল চুকে যেত। এলাকার সাধারণ জনগণের নিকটে অনুরোধ করব, আপনারা নিজেরা এগিয়ে আসুন। নিরপেক্ষ মনে পড়াশুনা করুন। ইনশাআল্লাহ সত্য প্রকাশিত হবেই। মনে রাখবেন, সংখ্যা কখনোই সত্যের মাপকাঠি নয়। দলীয় ফিক্বহ নয়, ছহীহ হাদীছ হবে একমাত্র ফায়ছালাকারী (স.স)]

কবিতা

এই বর্ষায়

মোল্লা আব্দুল মাজেদ
শিক্ষক, মৈশালা দাখিল মাদরাসা
পাংশা, রাজবাড়ী।

কলমি কমল কলি শাপলা ফুলে
ছল ছল জলধারে হাওয়ায় দোলে।
টলটলে মেঘে ঢাকা সুনীল আকাশ
সবুজের ঢেউ তোলে মৃদুল বাতাস।
ঝরঝর দিন ভর বাদল ধারা
ফুটিত কদম কেয়া খুশীতে ভরা।
নিশি-দিন ঘিন ঘিন ভেক দলে দল
ডোবা-নালা করে আছে জবর দখল।
বেতস বাগান ঘিরে ডাহুক ডাকে
ভেজা কাক অপলক চেয়েই থাকে।
ঝরঝর বারি ঝরে আপন মনে
অচেতন হয় মন সংগোপনে।

***

প্রতিবাদ

-মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ
বুড়িচং, কুমিল্লা।

তোমরা যারা এই শহরের উপর তলার লোক
চাও না তো ভাই বুঝতে মোদের কি পরিমাণ দুখ।
পাই না খেতে ঠিকমত আর পরতে না পাই জামা
বড় বড় কথার বেলা বেশ তো দেখি তোমা।
নির্যাতন আর নিষ্পেষণে খাটাও মোদের বেশ
একটু খানি করলে বিবাদ সব হয়ে যায় শেষ।
গায়ে খাটি আবার মার, তবুও কাজ করি,
এই অনাচার চলবে বল আর কতকাল ধরি?
আমরা শিশু সব বুঝি না তাইতো ঠকাও, না?
এখন যদি বলি মোরা, এ আর চলবে না।
হ্যাঁ, প্রতিবাদ! হ্যাঁ, প্রতিবাদ! চলবে চলুক দেখ
ছাড়ব না আর ধরলে এবার, এটাই মনে রেখো।
প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, প্রতিশোধের ঝড়
উপর তলার অত্যাচারী সব বেটারে ধর।

***

মেকি ইসলাম

আব্দুস সুবহান
বাংলা (শেষ বর্ষ)
পাংশা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, রাজবাড়ী।

নামে মুসলিম মোড়ল মেকি
মাযার প্রেমে মন মজায়ে
প্রভুর প্রেমে পাগল পারা
পীর প্রতারক খুব গজায়ে।
বলদ-বোকার বায়'আত করে
কামালিয়াতের কর্মে মাতায়
আশেকেতে হয় দেওয়ানা
অন্ধ গরু আর গাধায়।
ভণ্ড শরীফ, খাজা গরীব
চিল্লা, তরীক, পীর-বুড়া,
মুর্শিদে আর মুরিদ বাবায়
করছে রব-এর দ্বীন খোঁড়া।
ফেরকা হ'তে ফের ফিরে চাই
নির্ভেজাল সেই খেলাফত।
জীবন বিধান কুরআন এবং
ছহীহ হাদীছ নবীর পথ।

***

ঋতুচক্র

আতাউর রহমান মণ্ডল
মুংলী, চারঘাট, রাজশাহী।

রাত আসে রাত যায় চলে যায়,
দিন আসে দিন কোথায় হারায়
কেউ ভেবেছ কি?
কে আনে রাত কে আনে দিন
ভেবেছ কেউ কি?
গ্রীষ্ম আসে আগুন ঝরায়
খালে-বিলে নাই পানি নাই,
বট-পাকুড়ের ছায়ায় ছায়ায়
আম-কাঁঠালের সরসতায়
লিচু জামের মধুর রসে গ্রীষ্ম আসে কি?
বর্ষা মেঘের চাদর ওড়ায়
নদীভরা কানায় কানায়
ইলিশ নাচ-জলসায়
রসিক নেয়ে আসর জমায়,
ইলশে গুড়ি বৃষ্টিবুড়ী বর্ষা নামায় কি?
শরৎ আসে শিউলী কাশে
বিলে-ঝিলে শাপলা হাসে,
মুক্তা-মানিক ঘাসে ঘাসে,
বাদল বিহীন মেঘ আকাশে
কোন সুদূরে যায় ভেসে যায়, শরৎ পাঠায় কি?
হেমন্ত তার গানে গানে
পাকা ধানের সুবাস আনে
মিষ্টি মধুর ঘ্রাণে ঘ্রাণে
মাঠভরা সব পাকা ধানে
ডাক দিয়ে যায় নবান্নের ডাক হেমন্ত নাকি?
শীত আসে হিম হাওয়ায় উড়ে
মরণ কামড় দুনিয়া জুড়ে,
সরষে ক্ষেতে, পাহাড় চূড়ে,
সূর্য ঘুমায় কাঁথা মুড়ে,
খেজুর রসে, খেজুর গুড়ে, শীতের আসা কি?
বসন্ত আসে অনন্যা,
বনে বনে রঙের বন্যা।
মৌমাছি গুঞ্জনে ধন্যা
পিক-পাপিয়া সুরের কন্যা,
ঋতু রাজের আগমন গীতি গাইল তারা কি?
ছয়টি ঋতুই বারে বারে
আসে ফিরে স্ব সম্ভারে
ঋতু চক্রের চক্রটারে,
ঘোরায় কে তা নিয়ম মাফিক জেনেছ কেউ কি?
শিল্পী মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ আর পারে কি?

ক্ষেত-খামার

সবুজ সার ধঞ্চে

মানুষের দেহে যেমন রক্তের প্রয়োজন তেমনি মাটির প্রয়োজন জৈব পদার্থ। কিন্তু আমাদের দেশে রাসায়নিক সারের প্রচলন হওয়ার পর থেকেই চাষাবাদে আর খুব একটা জৈব সার ব্যবহার না হওয়ায় দিনের পর দিন দুর্ভাগ্যজনকভাবে মাটির জৈব উপাদান নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলে মাটি হয়ে যাচ্ছে প্রাণহীন। এই ঘাটতি ধঞ্চে অনেকটাই পূরণ করতে পারে। যার ব্যয়ও তুলনামূলক কম।

ধঞ্চে একটি আদর্শ সবুজ সার। আমাদের দেশের সবুজ সার হিসাবে এ ফসল খুব উপযোগী, যা বর্ষজীবী মাঝারি আকারের গাছ। ধঞ্চে গাছে দ্রুত ডালপালা ও প্রচুর পাতা জন্মে। কাণ্ডও নরম ও দ্রুত পচনশীল। শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করতে পারে। এটি গুটি জাতীয় ফসল হওয়ায় শিকড়ের গুটি থেকে মাটিতে নাইট্রোজেন যুক্ত হয়। বৈশাখ মাস থেকে ধঞ্চের চাষ করতে হয়। জ্যৈষ্ঠের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ বোনা যায়। বেলে, দো-আঁশ ও এটেল মাটিতে এর চাষ করা যায়। মাটির জো অবস্থায় দুই থেকে তিনবার চাষ ও মই দিয়ে হেক্টর প্রতি ৪০ থেকে ৫০ কেজি বীজ ভালভাবে ছিটিয়ে একটি চাষ ও মই দিয়ে বীজ ভালভাবে ঢেকে দিতে হবে। ধঞ্চের বাড়ন্ত ও শিকড়ে অধিক গুটি হওয়ায় হেক্টর প্রতি ৪ থেকে ৫ কেজি ইউরিয়া ও ৩০ থেকে ৩৫ কেজি টিএসপি সার প্রয়োগ করতে হবে। কোন নিড়ানির প্রয়োজন হয় না।

বীজ বোনার মাস দু'এক পরে গাছের ফুল আসলে মই দিয়ে গাছ ভেঙ্গে চাষ দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। গাছ অধিক বড় হ'লে, মই ও চাষ দেওয়ার সুবিধার জন্য গাছগুলি জমিতেই কেটে ছোট করতে হবে। চাষের সময় জমিতে অন্তত দুই সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখা প্রয়োজন, তাহ'লে গাছগুলি দ্রুত পচে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। এর সপ্তাহখানেক পরেই ধানের চারা রোপন করা যায়। কৃষি বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, সবুজ সার ধঞ্চে থেকে হেক্টর প্রতি প্রায় ৫ টন সবুজ সার পাওয়া যায়, যা প্রায় ২০০ কেজি নাইট্রোজেন সারের সমান। সেই সঙ্গে মাটির প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থের প্রয়োজনও মেটায় ধঞ্চে।

ধনেপাতা গ্রাম

ধনেপাতা চাষ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপযেলার কাদির জঙ্গলের বড়চর গ্রামের কৃষকরা। এ গ্রামের ৬০ একর জমিতে ধনে পাতার চাষ হচ্ছে। করিমগঞ্জের গরীব গ্রাম হিসাবে পরিচিত বড়চড়া গ্রাম এখন আর অভাবী গ্রাম নয়। কয়েকশ' কৃষকের নিরলস চেষ্টায় পুরো গ্রামের চিত্রই বদলে গেছে। এদের পথ দেখিয়েছেন এ গ্রামেরই দরিদ্র কৃষক ছন্দু মিয়াঁ। ভাগ্য পরিবর্তনের আকাঙ্খায় কাজ করে তারা সফল হয়েছেন।

ছন্দু মিয়াঁ ১৯৯৮ সালে উক্ত গ্রামে ধনেপাতা চাষ শুরু করেন। বর্তমানে ২০০ থেকে ৩০০ কৃষক ধনেপাতার চাষে জড়িত রয়েছেন। তাদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকেই ধনেপাতা চাষে ঝুঁকে পড়েছেন।

বাড়ির আশপাশে পরিত্যক্ত জমিতেও এ চাষ করা যায়। গাছের নিচে যেখানে অন্য ফসলাদি উৎপাদন সম্ভব হয় না, সেখানেও ধনেপাতা চাষ করে ভাল ফসল পাওয়া যায়। কার্তিক মাসে বীজ রোপনের উপযুক্ত সময়। ছন্দু মিয়াঁ বলেন, গ্রামে সর্বপ্রথম আমি দু'কাঠা জমিতে ধনেপাতার চাষ করি। সর্বসাকুল্যে খরচ পড়ে ১ হাযার টাকা। পাতা বিক্রি করে পেয়েছিলাম ২০ হাযার টাকার মত। প্রথমে ঢাকার কাপ্তান বাজার, শ্যাম বাজার, কাওরান বাজারে এগুলি নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতে হ'ত। এখন পাইকাররাই গ্রামে চলে আসে। আমি এ বছর ৩৮ কাঠা জমিতে ধনেপাতা চাষ করেছি। ৪০ হাযার টাকার পাতা এরই মধ্যে বিক্রি করেছি।

ধনেপাতা ব্যবসায়ী হযরত আলী বলেন, ৮ হাযার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলাম। এখন আমার ২ লাখ টাকা পুঁজি হয়েছে। কয়েকজন ধনেপাতা চাষী জানান, তাদের গ্রামটি এরই মধ্যে 'ধনেপাতার গ্রাম' হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে।

দুই সহোদরের ঔষধি বাগান

ঔষধি গাছের বাগান করে সংসারের চেহারাটাই বদলে ফেলেছেন দুই সহোদর জয়নাল (২৮) ও আয়নাল (২৫)। মাত্র সাত বছরের কঠোর শ্রম-সাধনায় এক সময়ের অভাবী পরিবারটি উঠে দাঁড়িয়েছে। পাঁচটি টিনের ঘর, মাছ ভরা পুকুর, কয়েক বিঘা ধানী জমি আর গোয়ালে দুধের গাভী হয়েছে তাদের।

পাবনার চাটমোহর উপযেলা সদর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরের মূলগ্রাম ইউনিয়নের প্রত্যন্ত বেজপাড়া গ্রামে এই সহোদরের বাড়ি। জয়নাল জানান, নাটোরের ছাপাখানায় কাজ করার সময় এক শরবত বিক্রেতা ঔষধি গাছের বাগান করার পরামর্শ দেন। তিনিই খোঁজ দেন নাটোরের সিংড়া বন্দরে ঔষধি গাছের বাগানের। ১৯৯০ থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত সেখান থেকে গাছ কিনে ঢাকা, গাযীপুর, নরসিংদীসহ বিভিন্ন যেলায় নিয়ে বিক্রি করতেন।

ছোট ভাই আয়নাল এস,এস,সি পাশের পর আর লেখাপাড়া না হওয়ায় বড় ভাইয়ের সঙ্গে যোগ দেন। '৯৭ সালে নাটোরের খামারগ্রামের আফাজ পাগলের বাগান থেকে গাছ নিয়ে শুরু করেন ব্যবসা। বর্তমানে তারা আরো ১৭ শতক জায়গায় বাগান করেছেন। সেখানে ঔষধি গাছের সঙ্গে ফুল চাষও করা হচ্ছে। তিনি প্রতি সপ্তাহে ঢাকা থেকে সিলেট গিয়ে গাছ বিক্রি করেন। সব খরচ বাদে সপ্তাহে ৩-৪ হাযার টাকা থাকে।

এখন বাগানে আছে, নীল কণ্ঠ, রাজকণ্ঠ, মিছরিদানা, তালমূল, শতমূল, সাদা লজ্জাবতী, শঙ্কমূল, আঁশটের গাছ, বনচাওলি, ভাইচণ্ডাল, তুরুকচণ্ডল, ব্রহ্মচণ্ডাল, ভুঁইকুমড়া, আমলকি, হরিতকি, বহেড়া, ঘৃতকাঞ্চন, অর্জুনসহ শতেক রকম গাছ-গাছড়া।

মহিলাদের পাতা

সন্তান প্রতিপালনঃ শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি

*শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন**

প্রাককথনঃ

সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপনের লক্ষ্যে আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهْرًا-

'তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন পানির উপাদান দিয়ে; অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন' *(ফুরক্বান ৫৪)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ أُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا-

'হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হ'তে এবং তোমাদেরকে করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যেন তোমরা পরস্পরে পরিচিতি লাভ করতে পার' *(হুজুরাত ১৩)*। উল্লিখিত আয়াতদ্বয় পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা ও উত্তম প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধির অত্যুৎকৃষ্ট উপাদান।

আধুনিক নাস্তিক্যবাদী বিশ্ব 'পরিবার ব্যবস্থার' বিরুদ্ধে যতই সোচ্চার হোক না কেন, আবহমান কাল থেকে মানুষ পরিবারবদ্ধ জীবন যাপন করে আসছে এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ক্বিয়ামত পর্যন্ত তা বহাল থাকবে। প্লেটো, এইচ. জি. ওয়েল্‌স গোষ্ঠীর প্রস্তাবানুযায়ী পরিবার বিবর্জিত জীবন যাপন করে মানুষ দুনিয়াতে টিকে থাকবে বটে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে উঠবে না।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্লেটো, ওয়েল্‌স এরমত দার্শনিকদের সঙ্গে এরিষ্টটল একাত্মতা ঘোষণা করতে পারেননি। তাঁর মতে, 'পরিবার একটি অতি স্বাভাবিক মানবীয় সংস্থা'।[১] একমাত্র পারিবারিক জীবনের মাধ্যমেই শিশুর সুপ্ত প্রতিভার স্ফূরণ ঘটিয়ে শিশুকে দুনিয়ার সম্পদে *(কাহফ ৪৬)* পরিণত করা সম্ভব। শিশুর দৈহিক, নৈতিক, মনঃস্তাত্ত্বিক, সম্ভাবনাময় মেধা ও ইসলামী শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে চাই সুহৃদ ও আদর্শবান ব্যক্তিত্বের সহযোগিতা। অর্থাৎ পরিবারের পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও অন্যান্য সদস্যকে শিশুর চরিত্র গঠনে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। বক্ষমাণ নিবন্ধে সন্তান প্রতিপালনে শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষিপ্তাকারে বিধৃত হ'ল।-

আদর্শ সন্তান গড়ে তোলায় ইসলামের পূর্ব প্রস্তুতিঃ

কবির ভাষায় 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে'। আজ যারা শিশু, তারাই বড় হয়ে একদিন দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়ে বিশ্ব জয়ে মেতে উঠবে। তারাই হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কর্ণধার। সুতরাং সন্তানকে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে যেকোন ধরনের শিথিলতা প্রদর্শন করা অনুচিত। ইসলাম শিশুর ভাবী জীবনের প্রতি যথাযথ মূল্যায়নের প্রতি অতি যত্নবান। মাতৃগর্ভে কিংবা পিতৃঔরসে আসার পূর্ব থেকেই সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। সে লক্ষ্যে পুরুষকে কনে নির্বাচনে বিশেষ কয়েকটি দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ-

'চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মেয়েকে বিয়ে করা হয়- তার সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য ও ধার্মিকতা। তবে তোমরা ধার্মিকা মেয়েকেই অগ্রাধিকার দাও'।[২] উল্লিখিত চারটি গুণের মধ্যে দ্বীনদারি বা ধার্মিকতা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রগণ্য। এ দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীটি উল্লেখযোগ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لاَ تَنْكِحُوْا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُرْدِيْهِنَّ وَلاَ لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُطْغِيْهِنَّ وَانْكِحُوْهُنَّ لِلدِّيْنِ وَلَأَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرْقَاءُ ذَاتُ دِيْنٍ أَفْضَلُ-

'তোমরা নারীর কেবল বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য দেখেই বিয়ে করো না। কেননা এ রূপ-সৌন্দর্য তাকে নষ্ট ও বিপথগামী করে দিতে পারে। ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেখেও বিয়ে করো না। কেননা প্রাচুর্য তাকে বিদ্রোহী ও দুর্বিনীত করে দিতে পারে। বরং বিয়ে করো নারীর পরহেযগারিতায় মুগ্ধ হয়ে। স্মরণ রেখো, কৃষ্ণকায়া দাসীও যদি দ্বীনদার হয়, তবে সে অন্যদের তুলনায় অনেক উত্তম'।[৩] কেননা সন্তান তাঁর মায়ের আচরণ, বৈশিষ্ট্য, চরিত্র, মেধা, আক্বীদা ও অভ্যাস ইত্যাকার অনেক বিষয়ই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। অপরদিকে সৎগুণ বঞ্চিতা সুন্দরী ও ধনাঢ্য নারীর প্রতি বিমোহিত হয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে।

---

* কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

১. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই ১৯৯৬), পৃঃ ৪৪।

২. বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৪৮।

৩. ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃঃ ১০১।

অনুরূপভাবে মেয়ের অভিভাবকেরও পাত্র নির্বাচন করার পথ বাতলে দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের নিকট এমন কোন লোকের বিবাহের প্রস্তাব আসে, যার ধর্মপরায়ণতা ও চরিত্র তোমাদের কাছে পসন্দনীয়, তাহ'লে তার সাথেই বিবাহ দিবে। যদি তোমরা এ নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হও, তবে পৃথিবীতে সৃষ্টি হবে বিশৃংখলা ও বিপর্যয়'।[৪]

বর্তমান বিজ্ঞানও স্বীকার করেছে যে, ইসলাম তাদের চেয়ে বহু অগ্রবর্তী ভূমিকার অধিকারী। কেননা প্রায় দেড় হাযার বছর পূর্বে ইসলাম একথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে, স্বামী-স্ত্রীর নির্বাচন যদি সুষ্ঠু ভিত্তির উপর সুসম্পন্ন হয়, তখন সন্তানেরা হবে আল্লাহ্র বিশেষ দান ও জীবনের সৌন্দর্য বিশেষ। সুতরাং প্রত্যেক পিতা-মাতার জন্য কর্তব্য হ'ল, ছেলে বা মেয়েকে ইসলামী পন্থায় উপযুক্ত পাত্রী বা পাত্রের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করানো। এতে করে আগামী প্রজন্ম হবে উন্নত থেকে উন্নততর।

নবজাতকের কর্ণে আযান শুনানোঃ

সন্তান জন্মের পর সর্বাগ্রে করণীয় হ'ল, নবজাতকের কর্ণে আযান শুনানো।

وعن ابى رافع قال رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ فى أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِالصَّلاَةِ-

'আবু রাফে' হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতেমা (রাঃ) যখন হাসান বিন আলীকে প্রসব করলেন, তখন নবী করীম (ছাঃ)-কে তার কানে ছালাতের ন্যায় আযান দিতে দেখেছি'।[৫]

উল্লেখ্য যে, ডান কানে আযান ও বাম কানে একামত শোনানোর হাদীছটি মওযূ' বা জাল। *(দ্রঃ আত-তাহরীক, এপ্রিল ২০০০, প্রশ্নোত্তর নং ১/১৮১)*। এছাড়া ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আযান দেয়ার প্রচলনটিও ভিত্তিহীন।[৬]

মাতৃদুগ্ধ পান করানোঃ

আল্লাহ বলেন,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ-

'যে সমস্ত জননী সন্তানদেরকে পুরো সময় পর্যন্ত দুগ্ধদানে আগ্রহী, তারা স্বীয় সন্তানদেরকে দু'বছর ধরে দুগ্ধদান করবে' *(বাক্বারাহ ২৩৩)*।

৪. *তিরমিযী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৫৬, ৬/১৪৫।*
৫. *তিরমিযী, আবুদাঊদ, আহমাদ, মিশকাত 'আক্বীক্বা' অধ্যায় হা/৩৯৭৮, ৮/১৪৩ পৃঃ।*
৬. *বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৮/১৪৩ পৃঃ।*

অর্থাৎ দু'বছর ধরে দুগ্ধদান করুক কিংবা এর কম সময় করুক, মায়ের উপর সন্তানকে দুগ্ধদান সাব্যস্ত হয়েছে উক্ত আয়াতের আলোকে। কেননা মাতৃদুগ্ধে রয়েছে অপরিমাণ উপকার। মাতৃদুগ্ধই শিশুর প্রথম ও প্রধানতম খাদ্য।

প্রাকৃতিক পন্থায় স্তন্যদান মায়ের মধ্যে সৃষ্টি করে শিশুর প্রতি এক বিশেষ স্নেহ প্রবণতা ও একটি আবেগের অনুভূতি তথা এক মহৎ দায়িত্ববোধ ও মাতৃত্বের অনুভূতির বিচ্ছুরণ।

মাতৃদুগ্ধ শিশুর জন্য অত্যুৎকৃষ্ট সুষম খাদ্য। এতে রয়েছে শিশুর প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত পুষ্টিকর উপাদান। ভিটামিন ও ইম্যুনুগ্লোবিউলিন। শিশু জন্মের প্রথম দুই/তিন দিন মায়ের স্তন থেকে Colostrum নিঃসৃত হয়। Colostrum হ'ল, পাতলা হলুদাভ তরল দুধ। এতে শতকরা ২০ ভাগ প্রোটিন থাকে। উক্ত প্রোটিনে বেশীর ভাগই থাকে ইম্যুনুগ্লোবিউলিন। ইম্যুনুগ্লোবিউলিনে থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খণিজ পদার্থ (Mineral) ও চর্বিবিহীন কার্বোহাইড্রেট।[৭] (Less fat carbohydrate)। সুতরাং Colostrum সদ্যজাত শিশুর জন্য অত্যন্ত উপকারী ও সহায়ক।[৮]

জীবন চলার পথে আমরা কৃত্রিম খাবারকে এতদিন সন্তানের জন্য অধিকতর উপযোগী মনে করে আসলেও আজ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণার সোপান বেয়ে সবশেষে একথা দ্রঢ়িষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে,

The milk from his own mother provides the baby the best from of nutritions and the best protection against infections, especially enteric infections and against the development of hypersensitivity.

'মাতৃদুগ্ধ শিশুর সর্বোত্তম পুষ্টি সরবরাহ করে এবং সংক্রামক ব্যাধি সফলভাবে প্রতিরোধ করে। বিশেষ করে অন্ত্র সম্পর্কীয় সংক্রামক। আর সংবেদনশীলতা (Hypersensitivity) বৃদ্ধির বিরুদ্ধেও কার্যকর ভূমিকা পালন করে'।[৯]

তাছাড়া দুগ্ধদান দুগ্ধবতী নারীর গর্ভধারণ প্রক্রিয়াকে স্বাভাবিক করতে এবং জন্মজনিত কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত শক্তিকে ফিরে পেতেও সহায়তা করে।[১০]

সুতরাং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুগ্ধদান কুরআনের এক রহস্যঘন উপদেশবাণী। তাই তো চিকিৎসা বিজ্ঞান কৃত্রিম দুগ্ধ ময়দানে দীর্ঘ বিচরণের পর খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে নাযিলকৃত কুরআনিক ফায়ছালার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে স্বীকার করেছে যে, 'মায়ের দুধের বিকল্প নেই'।

চরম স্নেহভরে মা যখন তার সন্তানকে বুকে টেনে নিয়ে দুধ পান করান, সন্তান তখন মায়ের উষ্ণ আদর অনুভব করে।

৭. *শাল জাতীয় পদার্থ, যা প্রাণীদেহকে সুগঠিত করে।*
৮. *Scientific indications in the holy Quran, (Islamic Foundation Bangladesh, June 1995) P. 86.*
৯. *Scientific indications in the holy Quran, (Islamic Foundation Bangladesh, June 1995) P. 86.*
১০. *Scientific Indications in the holy Quran, p-87-88; ইসলামে শিশু পরিচর্যা, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, মে ১৯৮৭), পৃঃ ৮০।*

যে সন্তান দুই থেকে আড়াই বছর পর্যন্ত মায়ের দুধ পান করে, সে সন্তান কখনোই মায়ের সঙ্গে অপ্রীতিকর আচরণ করতে পারে না। অপরপক্ষে তথাকথিত প্রগতিশীল নারীরা যখন আধুনিকতার খাতিরে কৃত্রিম উপায়ে বুকের দুধ উঠিয়ে তাদের সন্তানদেরকে 'ফীডার' ভর্তি করে দুধ পান করান, তখন মায়ের প্রতি সে সন্তানদের শ্রদ্ধা জাগবে কি করে? বর্তমানে সন্তানদের অবাধ্যতার অভিযোগ যে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে এর জন্য মূলতঃ দায়ী তাদের মা। কেননা সে সুষ্ঠু পরিচালনার অভাব বোধ করছে শৈশবকাল থেকেই।

সুন্দর নাম রাখাঃ

আল্লাহ পাক বলেন, 'তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না' *(হুজুরাত ১১)*।

আবূ সাঈদ খুদরী ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, সে যেন তার উত্তম নাম রাখে'।[১১]

সন্তান জন্মের পর তার সুন্দর নাম রাখতে হবে। এটা তার জন্মগত অধিকার। শিশুর নামকরণ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ-

'ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের নাম সমূহের মধ্যে আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান আল্লাহ্র নিকট অধিক পসন্দনীয়'।[১২] তাবারাণী বলেন, 'যে সমস্ত নামে আল্লাহ্র দাসত্ববোধক অর্থ প্রকাশ পায়, সে সব নাম আল্লাহ্র নিকট প্রিয়'।[১৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুন্দর নাম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৪] সুন্দর নাম রাখতে হ'লে উল্লিখিত পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এমনটি নয়, বরং শরী'আত সম্মত ও সুন্দর অর্থপূর্ণ হ'লেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ পালিত হবে ইনশাআল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন অমার্জিত ও খারাপ অর্থপূর্ণ নাম শুনলে তা পরিবর্তন করে ভাল নাম রেখে দিতেন। যেমন,

عن عباس قال كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اِسْمُهَا بَرَّةُ فَحَوَّلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِسْمَهَا جُوَيْرِيَةَ-

'জুয়াইরিয়া (রাঃ)-এর পূর্বনাম ছিল 'বার্রাহ্'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা পরিবর্তন করে জুয়াইরিয়া রাখেন'।[১৫]

ওমরা (রাঃ)-এর কন্যা আছিয়ার নাম পরিবর্তন করে তার নাম জামীলা রাখেন।[১৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

تَسَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمُ أُقْسِمُ بَيْنَكُمْ-

'তোমরা আমার নামে নাম রাখ, আমার উপনামে নাম রেখনা। কেননা আমি 'ক্বাসেম' বা বন্টনকারী, তোমাদের মাঝে নবুওয়াত ও রিসালাত বন্টন করি'।[১৭] এছাড়া আফলাহ্, রাবাহ, ইয়াসার, নাফে, নাজীহ, নাম রাখতেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন।[১৮]

ক্বিয়ামতের দিন 'মালিকুল আমলাক' (রাজাধিরাজ) নামধারী লোক আল্লাহ্র ক্রোধে নিপতিত হবে। কারণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন অধিকর্তা নেই।[১৯] এখানে শাহআলম, শাহানশাহ ইত্যাদি নামগুলি অন্তর্ভুক্ত।

শুধু আল্লাহ্র নামে নাম যেমন, রহীম, করীম, রহমান ইত্যাদি রাখা বা সম্বোধন করা নিষিদ্ধ। বরং আল্লাহ্র নামের সাথে 'আবদ' (عَبْدٌ) যুক্ত করে সম্বোধন করতে হবে। সেক্ষেত্রে এটি আল্লাহ্র পসন্দীয় নাম হবে।

এছাড়া আবুল বাশার (মানবজাতির পিতা) নাম রাখাও ঠিক নয়। কারণ এটি আদম (আঃ)-এর উপাধি, যা আদম (আঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট।

নবীউল্লাহ (আল্লাহ্র নবী), গোলাম রাসূল (রাসূলের বান্দা), গোলাম হোসাইন (হোসাইনের বান্দা), গোলাম মোস্তফা (মোস্তফার বান্দা) ইত্যাদি নাম শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যাদের এ জাতীয় নাম আছে, তাদের নাম হাদীছ অনুযায়ী পরিবর্তন করে নেয়া কর্তব্য। বিদঘুটে, অসম্পূর্ণ ও কুরুচিপূর্ণ নাম রাখা সঙ্গত নয়। কারণ উক্ত নাম ব্যক্তি ও ব্যক্তির বংশের জন্য কষ্টের কারণ হ'তে পারে।[২০] সুতরাং সন্তানের নাম রাখার পূর্বে নামের অর্থ জেনে নিতে হবে।

[চলবে]

১১. *বায়হাক্বী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/৩০০৩, ৬/১৬৪ পৃঃ।*
১২. *ছহীহ মুসলিম (রিয়াযঃ দারুল আলাম আল-কুতুব, ১৯৯৬), কিতাবুল আদাব, হা/২১৩২, ৩/১৬৮২ পৃঃ; বঙ্গানুবাদ হা/৪৫৪৬।*
১৩. *বঙ্গানুবাদ মিশকাত, ৯/৫৪. উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*
১৪. *আহমাদ, আবুদাউদ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/৪৫৬১।*
১৫. *ছহীহ মুসলিম, হা/২১৪০, ৩/১৬৮৭ পৃঃ।*
১৬. *মুসলিম হা/২১৩৯।*
১৭. *মুসলিম হা/২১৩৩।*
১৮. *মুসলিম হা/২১৩৬।*
১৯. *মুসলিম হা/২১৪৩।*
২০. *বুখারী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫৭২, ৯/৬৪ পৃঃ।*

এম, এস মানি চেঞ্জার
বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত
বিদেশী মুদ্রা, ডলার, ... জয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, ... রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ... নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ... এনডোর্সমেন্ট করা হয়।
প্রোঃ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী
(ইস্টার্ণ ব্যাংকের পশ্চিমে)
ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২
মোবাইলঃ ০১৭১-৮১৬৫৭৮; ০১৭১-৯৩০৯৬৬।

পাতা

গত সংখ্যার সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

- পলিকাদোয়া, জয়পুরহাট থেকেঃ রূহুল আমীন, খোবাইব, মু'আয, মাহফূযুর রহমান, মরিয়ম, সাইমা ও রুকসানা।
- নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী থেকেঃ মুহাম্মাদ শওকত আলী।
- কোর্ট চাঁদপুর, ঝিনাইদহ থেকেঃ ইমরান হোসাইন ও যুবায়ের হোসাইন।
- পুঠিয়া, রাজশাহী থেকেঃ আশিক আলী।
- গোদাগাড়ী, রাজশাহী থেকেঃ আনারুল ইসলাম।
- মোহনপুর, রাজশাহী থেকেঃ বযলুর রশীদ, মুহাইমিনুল ইসলাম, আহসান নাযির, আবদুল মান্নান ও কাওছার।
- কাঁচারীপাড়া, জামালপুর থেকেঃ আরিফুর রহমান, তারেক মাহমূদ, আশরাফুল ইসলাম ও আবুল খায়ের।
- গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকেঃ গোলাম সারওয়ার, গোলাম মুক্তাদির, গোলাম কবীর ও আরীফুল ইসলাম।
- পীরগঞ্জ, রংপুর থেকেঃ হাফীযুর রহমান ও রাকীবুল ইসলাম।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধার আসর)-এর সঠিক উত্তর

১। ম্যাচ/দিয়াশলাই। ২। সাহস।
৩। জলপাই। ৪। জ্ঞান।
৫। বাতাস (অক্সিজেন)।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, দৈর্ঘ্য ১৫৫ কিঃ মিঃ।
২। সেন্টমার্টিন দ্বীপ।
৩। পালংকি, ক্যাপ্টেন কক্স-এর নামানুসারে।
৪। ১৬ শতকের দিকে প্রথম জনবসতি শুরু হয়।
৫। নারিকেল জিনজিরা।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বর্ণজট)

সোনামণিরা অক্ষরগুলি সাজিয়ে অর্থবোধক শব্দ তৈরী কর।

১। টাকউরম্পি। ২। বালফোইনমো।
৩। দূরত্রক্ষবিণয। ৪। গজ্ঞাভান বিবি।
৫। নামসোণি।

❑ ইমামুদ্দীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দেশ)

১। কোন দেশকে শাপলা ফুলের দেশ বলা হয়?
২। কোন শহরকে মোবাইল শহর বলা হয়?
৩। কোন অঞ্চলকে পৃথিবীর স্বর্গ বলা হয়?
৪। কোন দেশকে নদীমাতৃক দেশ বলা হয়?
৫। কোন শহরকে মসজিদের শহর বলা হয়?

❑ ইমামুদ্দীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১লা জুন মঙ্গলবারঃ অদ্য দুপুর ১২টায় যেলার ভোলাহাট থানাধীন মুশরীভুজা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। জনাব দুরুল হূদা বিশ্বাস (সাবেক মেম্বর)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন, আন্দোলনের অন্যতম সুধী আফসার বিন ইমাদুদ্দীন প্রমুখ।

একই দিন বাদ আছর স্থানীয় খয়রাবাদ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' সংগঠনের বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী উক্ত সমাবেশে যোগদান করেন।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১০ জুন বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ যোহর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীতে 'সোনামণি' মারকায উপশাখার দায়িত্বশীলগণের উদ্দেশ্যে সোনামণি গঠনতন্ত্র ও জ্ঞান কোষের উপর এক বিশেষ লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

অতঃপর বাদ মাগরিব প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয় এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ ও মারকায শাখার দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন।

লড়বো মোরা

-নাজমুল হক
শাহমখদুম থানা মোড়
সপুরা, রাজশাহী।

একটা 'বদর' এই যামানায় বড় প্রয়োজন
আল্লাহ তুমি দাও ক্ষমতা করতে আয়োজন।
আল্লাহ আছেন মোদের তরে রাসূল মোদের নেতা
মানবো না মোরা ভণ্ড নীতি বাতিলের কোন কথা।
বাতিলের বিরুদ্ধে লড়বো মোরা জীবন করে পণ
এই শপথ করি আমরা সকল মুসলমান
বিশ্ব মাঝে মুক্ত মোরা করবো মুসলমান
এ প্রার্থনা তব দ্বারে হে আল্লাহ মহান।

***

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০৪-এর তারিখ

১। স্ব স্ব শাখায়	৩ সেপ্টেম্বর	শুক্রবার	সকাল ৮-টা
২। ,, থানা মারকাযে	১০ সেপ্টেম্বর	,,	,,
৩। ,, যেলা মারকাযে	১৭ সেপ্টেম্বর	,,	,,
৪। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে	২৪ সেপ্টেম্বর	,,	,, সাড়ে ৬টা

উল্লেখ্য যে, শাখা, থানা ও যেলার তারিখ অপরিবর্তনীয় থাকবে। তবে প্রয়োজন সাপেক্ষে কেন্দ্রের তারিখ পরিবর্তন হ'তে পারে।

কেন্দ্রীয় পরিচালক
সোনামণি

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

সমুদ্র উপকূলে ছড়িয়ে আছে হাযার হাযার কোটি টাকার খনিজ সম্পদ

বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ সমুদ্র উপকূলে অবহেলিত অবস্থায় বালিতে ছড়িয়ে আছে প্রচলিত খনিজ সম্পদ গ্যাস ও কয়লার চেয়ে হাযারগুণ দামী 'কালো সোনা' খ্যাত জিরকন, রুটাইল, ইলমেনাইট, লিউকক্সিন, ম্যাগনেটাইট, গার্নেট, মোনাজিট, কায়ানাইট প্রভৃতি খনিজ সম্পদ। এ সম্পদ পরিকল্পিত উপায়ে আহরণ করা গেলে তা পাল্টে দিতে পারে বাংলাদেশের চেহারা। কেবলমাত্র জিরকন, ইলমেনাইট ও রুটাইলের যে মওজুদ বাংলাদেশে রয়েছে প্রাথমিক হিসাবে তার মূল্যই ৩৮৭ লাখ কোটি টাকা।

কক্সবাজার থেকে টেকনাফ কিংবা কুয়াকাটা থেকে নিঝুম দ্বীপ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সমুদ্র সৈকতে রাশি রাশি বালুর উপর দিয়ে হাঁটার সময় বালুর মধ্যে কালো একটি অংশ দেখতে পাওয়া যায়। ছড়িয়ে থাকা বালির এই কালো অংশটিই হ'ল 'ব্ল্যাক গোল্ড' বা 'কালো সোনা'। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ উপকূল জুড়ে এই কালো সোনার মওজুদ রয়েছে লাখ লাখ টন, যার মূল্য সোনালী রঙের সোনার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। সোনার চেয়ে দামী এই খনিজদ্রব্য ব্যবহৃত হয় এটোম বোমা, পারমাণবিক চুল্লি, কৃত্রিম হার্ট, সাবমেরিন এমনকি সুপরিসর বিমান তৈরীতে। সিরামিক, কাষ্টিং, মোল্ডিং, মেটাল, ওয়েল্ডিং, ইলেক্ট্রোড, কাগজ, রাবার, টেক্সটাইল, ইউরেনিয়াম রড, গ্রাইন্ডিং ষ্টোন ও ইলেকট্রনিক শিল্পেও উল্লিখিত খনিজদ্রব্য অপরিহার্য উপাদান। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের এক সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের উপকূলের বালিতে ৮টি মূল্যবান হেভি মিনারেলের গড় পরিমাণ শতকরা ২৩ ভাগ।

জিরকন, ইলমেনাইট ও রুটাইলের মূল্যঃ ১৯৯৩ সালে তৎকালীন আন্তর্জাতিক বাজার দর অনুযায়ী জিরকনিয়াম ৯৯.৮% পরিশোধিত অবস্থায় তার গুঁড়ো দিয়ে যে ধাতু তৈরী করা যায়, সেটার বাজার দর প্রতি কেজি ৯০ হাযার টাকা। আমাদের দেশের বালিতে জিরকনের সম্ভাব্য মওজুদের পরিমাণ কমপক্ষে দেড় লাখ টন। এই জিরকন থেকে প্রায় ১ লাখ টন জিরকনিয়াম পাউডার তৈরী করা সম্ভব। সে অনুযায়ী আমাদের দেশের জিরকনের মোট আন্তর্জাতিক বাজার দর ৯ লাখ কোটি টাকা।

ইলমেনাইটের রাসায়নিক নাম টাইটেনিয়াম। ৯৯.৯% বিশুদ্ধতায় প্রতি কেজি টাইটেনিয়াম মেটাল রডের আন্তর্জাতিক বাজার দর ১ লাখ ৮৩ হাযার টাকা। সে অনুযায়ী ৭ লাখ টন টাইটেনিয়াম ধাতুর বাজার মূল্য প্রায় ১২৮ লাখ কোটি টাকা।

৯৯.৬% পরিশোধিত অবস্থায় গুঁড়ো রুটাইলের আন্তর্জাতিক বাজার দর কেজি প্রতি ২৫০০০ টাকা। এ হিসাবে ১ লাখ টন রুটাইলের দাম দাঁড়ায় আড়াই লাখ কোটি টাকার বেশী। আমাদের দেশে প্রাপ্ত খনিজদ্রব্যগুলির বিশুদ্ধতা এই পর্যায়ে নিতে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন। কষ্টসাধ্যও বটে। তবে তা অসম্ভব নয়। উল্লেখ্য যে, উপকূলীয় বালিতে মূল্যবান খনিজ মওজুদের বিবেচনায় বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান দ্বিতীয়। আরো উল্লেখ্য যে, সমুদ্র উপকূলের বালি থেকে খনিজ আহরণের ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া শীর্ষে।

[বালি থেকে খনিজ আহরণের সাথে সাথে দেশের ১৪ কোটি মানুষের মধ্য থেকে সম্পদগুলিকে মূল্যায়ণ করুন। এরাই দেশের মূল সম্পদ, আল্লাহ্র অমূল্য নে'মত (স.স)]

রংপুরে দরিদ্র মুসলমানদের প্রকাশ্যে খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে

বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের মানুষের সরলতার পাশাপাশি দরিদ্রতা ও বেকারত্বকে পুঁজি করে এ অঞ্চলের বেকার ও অভাবগ্রস্ত মুসলমানদের মোটা অংকের আর্থিক সাহায্য দিয়ে খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের এই কাজটি এ অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে গোপনে চলতে থাকলেও ইদানীং তা প্রকাশ্য রূপ নিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে তাদের সহায়তা করছে বিভিন্ন পেশার কতিপয় লেবাসধারী মুসলমান।

পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা ছোটখাট নানান সংস্থা কিংবা এলাকাভিত্তিক লেবাসধারী মুসলমানদের মাধ্যমে গরীব, অসহায় এবং বেকার যুবক-যুবতীদের মোটা অংকের আর্থিক সহায়তা দিয়ে খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করে নিচ্ছে। ধর্মান্তরিত ঐসব গরীব, অসহায় ও বেকার যুবক-যুবতীদের শ্রেণী মোতাবেক ব্যবসা করার জন্য এককালীন মোটা অংকের টাকা প্রদান ছাড়াও শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থায় চাকরি দেয়া হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অসহায়, অক্ষম পরিবারগুলিকে সপ্তাহের প্রতি রবিবার ৫শ' থেকে ১ হাযার করে টাকাও প্রদান করা হচ্ছে। খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত এসব লোক নিজ এলাকায় পূর্বের নামে পরিচিত থাকলেও গোপনে তাদের খ্রীষ্টান ধর্ম অনুযায়ী নাম এবং শরীরের গোপন স্থানে (পুরুষদের পশ্চাদাংশে এবং নারীদের স্তনের নীচে) বিশেষ একটি 'সিল' মেরে দেয়া হচ্ছে। এতে রেজিষ্ট্রেশন নম্বরসহ বেশ কিছু সাংকেতিক চিহ্নও অন্তর্ভুক্ত আছে। বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুরে ইতিমধ্যে কমপক্ষে ১০ থেকে ১৫ হাযার মুসলমান খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে।

[দেশের প্রতিটি যেলায় এদের নেটওয়ার্ক বিছানো আছে। সারা দেশে দৈনিক হাযারো মানুষ খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এদিকে দৃষ্টি দিলেই সব ধরা পড়বে। ১৭ হাযারের মত এনজিও-র সূদী ব্যবসার বন্ধনে আবদ্ধ এদেশের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে এদের খপ্পর থেকে মুক্ত করার পথ বের করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন রইল। নইলে সেদিন আর দূরে নয়, যেদিন ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরের ন্যায় বাংলাদেশেও আরেকটি খৃষ্টান স্টেট কায়েম হয়ে যাবে ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের সমর্থনে (স.স)]

শাহজালালের মাযারে বোমা হামলা

গত ২১ মে সিলেটে শাহজালালের মাযারে জুম'আর ছালাত শেষে এক ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এতে দু'জন নিহত এবং বাংলাদেশে নবনিযুক্ত বৃটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী ও সিলেটের যেলা প্রশাসকসহ প্রায় ৭০ জন আহত হয়েছে। এই ন্যক্কারজনক হামলার ঘটনায় গোটা সিলেটবাসী স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে নবনিযুক্ত বৃটিশ হাইকমিশনার তার তিন দিনের সিলেট সফরে গত ২১ মে শাহজালালের মাযার মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করেন। ছালাতান্তে কমিশনার এবং যেলা প্রশাসক যখন মাযার গেট দিয়ে বের হয়ে আসছিলেন, সে সময়ই বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। সিলেট

যেলা বারের সভাপতি এডভোকেট আব্দুল হাই খান বলেন, পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাবেই এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে। আইন-শৃংখলা রক্ষা বাহিনীর এরূপ অবহেলার কারণেই স্বয়ং যেলা প্রশাসককে উৎসুক মানুষের ভিড় ঠেলে হাই কমিশনারের যাতায়াতের পথ সুগম করতে হয়। এ সময় মাত্র ২ জন পুলিশ কর্তব্যরত ছিল। বিস্ফোরণের কারণে মাযারের প্রধান ফটকের টাইলসও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে গত ১২ জানুয়ারী রাত সাড়ে আটটায় শাহজালাল মাযারে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এতে তাৎক্ষণিকভাবে দু'জন সহ মোট পাঁচজন নিহত হয়।

[আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই এবং প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানের আহ্বান জানাই (স.স)]

দুর্নীতির কারণে প্রতিবছর সরকারের অপচয় ১২ হাযার কোটি টাকা

গত ২৫ মে জাতীয় প্রেসক্লাবে জাতীয় কর আইনজীবী সমিতি আয়োজিত 'দুর্নীতি জাতীয় রাজস্ব বৃদ্ধির অন্তরায়' শীর্ষক এক সেমিনারে দেশের খ্যাতনামা আইনবিদ, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও আইনজীবীরা বলেন, দুর্নীতির কারণেই দেশের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে না। দুর্নীতির কারণে দুর্বিষহ জনভোগান্তি ছাড়াও সরকারের প্রতিবছর অপচয় হচ্ছে কমপক্ষে ১২ হাযার কোটি টাকা। অপরদিকে দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের কারণে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর ৬০ হাযার কোটি টাকা অবৈধভাবে বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। অথচ দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে এই বিপুল পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় করা গেলে তা থেকে সরকারের রাজস্ব যেমন বৃদ্ধি পেত তেমনি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে দাতাগোষ্ঠীর ঋণ বা সাহায্যের জন্য আর নির্ভর করতে হ'ত না।

[এতদিনে একটা হিসাব পাওয়া গেল। প্রকৃত হিসাব এর চাইতে বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা ঢাকার একজন নিহত সন্ত্রাসী কমিশনারের দৈনিক আয় ছিল আড়াই লক্ষ টাকা। অতএব কোটি টাকা এখন ছোট ব্যাপার। ক্বিয়ামতের পূর্বে এভাবেই টাকার ছড়াছড়ি হবে। কিন্তু এইসব দুর্নীতিবাজদের ঠেকাবে যারা, তারা কি নিজেরা দুর্নীতিমুক্ত (স.স)]

৪২ শতাংশ পরিবারের চাষযোগ্য কোন জমি নেই

গত ২৬ মে সিরডাপ মিলনায়তনে 'আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট' (ইরি) ও 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ' (সিপিডি)-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত গ্রামীণ বাংলাদেশে দারিদ্র্যের স্বরূপ এবং দরিদ্রমুখী উন্নয়ন সংক্রান্ত এক সংলাপ অনুষ্ঠানে বলা হয়, ২০০১ সালের শুমারী অনুসারে দেশের ৪২ শতাংশ পরিবারের চাষযোগ্য কোন জমি নেই। যেসব এলাকায় ভূমিহীনের সংখ্যা যত বেশী, সেসব এলাকায় দারিদ্র্যও তত বেশী। গ্রামীণ এলাকার এ দারিদ্র্যের পেছনে অবকাঠামোর অপর্যাপ্ততা, ভৌগোলিক অবস্থানগত ভঙ্গুরতা, প্রাকৃতিক সম্পদ লভ্যতা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধার অপ্রতুলতা ও দুর্যোগ-দুর্বিপাক মূল ভূমিকা রেখেছে। সংলাপে বলা হয়, বৈষম্যের কারণে পল্লী এলাকায় শহরের তুলনায় গড় আয়ু অনেক কম। ২০০১ সালের শুমারী অনুযায়ী গ্রামীণ পরিবারে মাথাপিছু আয় মাত্র ১৯৭ ডলার। ১৬৮ মার্কিন ডলার আয়কে দারিদ্র্যসীমা ধরা হ'লে পল্লী এলাকার ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যসীমার নীচে পাওয়া যায়।

[বলা চলে দেশের অর্ধেক জনসংখ্যার কোন চাষযোগ্য জমি নেই। অথচ বেরুবাড়ী, দক্ষিণ তালপট্টি এখনো ভারতের দখলে। শুধু দক্ষিণ তালপট্টিতেই সিকি বাংলাদেশের আয়তন পরিমাণ জমি রয়েছে। দুর্বলচেতা সরকার কখনো সাহসী হবে কি (স.স)]

প্রতিমন্ত্রীকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টায় এসপি গ্রেফতার

গত ৩রা জুন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে ঢাকার সিআইডি থেকে সদ্য বদলীকৃত এসপি এম এ বাতেন গ্রেফতার হয়েছেন। তিনি তার বদলী ঠেকাতে ৩ লাখ টাকা ঘুষ দিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গেলে তাকে হাতেনাতে আটক করা হয়।

খবরে প্রকাশ, গত ১ জুন সিআইডি'র এসপি বাতেনকে খাগড়াছড়িতে বদলী করা হয়। পুলিশ বাহিনীতে প্রচলিত নিয়ম রয়েছে, কাউকে বিভাগীয় শাস্তি প্রদানের জন্য তাকে খাগড়াছড়িতে বদলী করা হয়। আদেশের পর থেকেই এসপি বাতেন তার বদলী ঠেকানোর জন্য বিভিন্নভাবে তদবীর শুরু করেন। অবশেষে গত ৩রা জুন বিকাল সাড়ে ৩-টায় তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে যান। প্রতিমন্ত্রী লুৎফুযযামান বাবর তাকে রুমে ঢোকার অনুমতি দিলে তিনি একটি কাগজের প্যাকেটে ৩ লাখ টাকা দিয়ে বলেন, 'স্যার বদলীর আদেশ বাতিলের জন্য এখানে কিছু টাকা আছে। আপনাদের পার্টি চালাতে খরচ লাগে সেজন্য এটা দিলাম। আর প্রতিমাসে এসে দিয়ে যাব'। এসপি'র এই বক্তব্যে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। তিনি অবৈধ উৎকোচ প্রদানের অভিযোগে এসপি বাতেনকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেন। অবৈধভাবে উৎকোচ প্রদানের অভিযোগে ১৬৫ (ক) দণ্ডবিধির আওতায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। এ ব্যাপারে রমনা থানায় একটি মামলা (নম্বর-১৪) দায়ের করা হয়েছে।

[এজন্য আমরা মন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। তবে কেন যেন আশংকা জাগে যে, আগে থেকে প্রচলন না থাকলে একজন নিম্নপদস্থ পুলিশ অফিসার এভাবে মন্ত্রীর টেবিলে ঘুষের টাকা সরাসরি দিতে যায় কোন্ সাহসে? তবুও যদি ঐ পুলিশ কর্মকর্তা এরূপ হিম্মত দেখিয়ে থাকে এবং তা প্রমাণিত হয়, তবে তাকে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন, যাতে অন্যের শিক্ষা হয়ে যায় (স.স)]

ঢাকায় ৬ তলা ভবন ধসে নিহত ১৮

পুরান ঢাকার ব্যস্ততম বাণিজ্যিক-আবাসিক এলাকা শাঁখারী বাজারে গত ৯ জুন বুধবার দিবাগত ভোর রাতে একটি বহু বছরের পুরাতন ছয়তলা বাড়ী ধসে ১৮ জন নিহত ও ১০ জন আহত হয়েছে। বাড়ীটির নিচের তিনতলা একবারে মাটির সাথে মিশে যায় এবং উপরের তিনতলা হেলে গিয়ে রাস্তার অপর পাশের একটি ভবনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আটকে যায়। ঘুমন্ত অবস্থায় আকস্মিক এ দুর্ঘটনায় ভবনের অনেক সদস্য আটকা পড়েন। মর্মান্তিকভাবে নিহত হন অন্যূন ১৮ জন। শুরু হয় চিৎকার কান্না। পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। স্বজনহারাদের আহাজারিতে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। উক্ত ঘটনায় এলাকার পুরাতন ভবনে বসবাসকারীরা তাদের বাসস্থান ছেড়ে চলে যেতে শুরু করে।

উল্লেখ্য যে, ধসে যাওয়া ভবনে ৪টি মতান্তরে ৮টি পরিবারের ৪০ জন লোক বসবাস করত। ৬ তলা বিশিষ্ট এই ভবনটির মালিক হচ্ছে তিনজন। তারা হ'ল, লক্ষ্মী ভূষণ দত্ত, সুচিনাগ এবং পাগলনাথ নাগ। ভবনের নীচতলায় ছিল দোকান।

ধসে পড়ার কারণঃ ২শ' বছরের পুরাতন এ ভবনটির নীচের ৩ তলা চুন-সুরকি দিয়ে তৈরী। ৮ বছর পূর্বে ঝুঁকিপূর্ণ এই ভবনটির উপরে আরো ৩ তলা নির্মাণ করা হয়। নতুন তিন তলা নির্মাণের সময় উক্ত ভবনের অনেক দেয়ালে ফাটল ধরেছিল। নানা প্রকার

গাছও বেড়ে উঠেছিল এসব ফাটল দিয়ে। এ অবস্থায়ই নতুন ৩ তলা নির্মাণ করা হয়। এ তিন তলা নির্মাণ কাজের কোন সরকারী অনুমোদন নেই। ছিল না কোন দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রকৌশলীর পরামর্শ। এসব কারণেই পুরো ভবনটিই হয়ে ওঠে বিপজ্জনক। সম্প্রতি ঝড়-বৃষ্টির কারণে এর উপর দিয়ে আরেক দফা ধকল যায়। পাশাপাশি গত কয়েক দিন পূর্বে পাশের ৮২ নং ভবনটি ভেঙ্গে ফেলা হয় পুনঃনির্মাণের জন্য। এ ভবনের দেয়াল ঘেষে প্রায় ২০ ফুট গর্ত করে পাইলিংয়ের কাজ চলছিল, যার প্রভাবও এর উপরে পড়ে। এ সবই এ দুর্ঘটনার কারণ বলে জানা যায়। উল্লেখ্য, শাঁখারী বাজার এলাকার ১৪০টি বাড়ীর মধ্যে ১২০টিই ঝুঁকিপূর্ণ।

[রাজউকের সংশ্লিষ্ট বিভাগকেই এর দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। যারা পরিত্যক্ত ঘোষিত এইসব জরাজীর্ণ বিল্ডিংগুলো পূবেই ভেঙ্গে না দিয়ে অপরাধ করেছেন। আমরা নিরীহ মানুষের এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করছি (স.স)]

২০০৪-০৫ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেট পেশ

গ্রামমুখী সম্পদ প্রবাহ বৃদ্ধি, নিজস্ব প্রয়োজনে সংস্কারকে এগিয়ে নেয়া এবং আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহ বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিয়ে ২০০৪-০৫ অর্থবছরের জন্য ৫৭ হাযার ২৪৮ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। গত ১০ জুন বৃহস্পতিবার বিকেল ৪-টায় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম, সাইফুর রহমান সংসদে ২০০৪-০৫ অর্থবছরের বাজেট পেশ করেন। এ সময় আওয়ামীলীগের সংসদ সদস্যগণ অধিবেশন কক্ষে ছিলেন না। তবে জাতীয় পার্টির সদস্যগণসহ সরকারী দলের মন্ত্রী ও অন্যান্য সংসদ সদস্য বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

বাজেট পরিসংখ্যানঃ প্রস্তাবিত বাজেটে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৭ হাযার ২৪৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৩৪ হাযার ৫৬৫ কোটি টাকা অনুন্নয়ন ব্যয় এবং ২২ হাযার ৬৮৩ কোটি টাকা উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বাজেটে নীট অর্থায়নযোগ্য বাজেট ঘাটতি হ'ল ১৪ হাযার ৫৯ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী অর্থ বছরের মূল বাজেটে এ ঘাটতি ছিল ১৩ হাযার ২২৩ কোটি টাকা। বাজেটের ঘাটতি অর্থায়নের মধ্যে বৈদেশিক ঋণ খাত থেকে আসবে ৬ হাযার ৯৯৬ কোটি টাকা। বাকি ৭ হাযার ৯৯ কোটি টাকা আসবে আভ্যন্তরীণ খাত থেকে। এর মধ্যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ২ হাযার ৫৯৯ কোটি টাকা এবং সঞ্চয়পত্র ও অন্যান্য খাত থেকে ৪ হাযার ৫০০ কোটি টাকা আসবে।

নতুন অর্থ বছরের বাজেটে ৫৭ শতাংশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কর খাত থেকে আসবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর খাত থেকে আসবে ৩ শতাংশ এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব খাত থেকে ১৩ শতাংশ। এর বাইরে ১২ শতাংশ আভ্যন্তরীণ খাত থেকে এবং১২ শতাংশ বৈদেশিক উৎস থেকে অর্থায়ন করা হবে।

এবারের বাজেটে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে সর্বোচ্চ ব্যয় ধরা হয়েছে শিক্ষাখাতে। এই খাতে মোট ৭ হাযার ৬৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এই বরাদ্দ মোট বাজেটের ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ। উন্নয়ন বাজেটে শিক্ষা খাতে ৫১টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৩ হাযার ৭১ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যয়ের খাত হচ্ছে সূদ। এই খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ১১ শতাংশ।

যেসব জিনিসের দাম বাড়বেঃ আগামী অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটে আমদানী শুল্ক ও ভ্যাটের আওতা বাড়ানোর ফলে মূল্য বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে মোটরগাড়ী, জীপ, রুই, কাতল, মৃগেল, পাঙ্গাস মাছ, হিমায়িত চিংড়ি, আন্তঃনগর ট্রেনের টিকিট, আভ্যন্তরীণ রুটে বিমানের টিকিট। এছাড়া ভ্যাটের আওতায় আরো ৮টি পণ্য ও বিভিন্ন সেবা খাতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব পণ্য তালিকায় রয়েছে, উৎপাদন পর্যায়ে প্রেসার কুকার, আমদানী পর্যায়ে এলপি গ্যাস সিলিণ্ডার, কমিউনিটি সেন্টারে খাদ্য পরিবেশন, আমদানী পর্যায়ে হটরোল কয়েল, নারিকেল কোপরা ও র'সিল্ক। সেবা খাতগুলি হচ্ছে শুটিংস্পট, অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, থিম পার্ক, ঐতিহাসিক স্থান, পিকনিক স্পট, পর্যটন স্থান বা স্থাপনা। ভবন, মেঝে ও অঙ্গন পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থা, অর্থলগ্নী বা ঋণদান প্রতিষ্ঠান, এক্সপ্রেস মেইল (কুরিয়ার) সার্ভিস, চলচ্চিত্র পরিবেশক, লটারীর টিকিট ও বিক্রয়কারী, ঢাকা ও চট্টগ্রামের অভিজাত দর্জির দোকান, বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ সংস্থা প্রভৃতি।

যেসব জিনিসের দাম কমবেঃ আমদানী শুল্ক ও ভ্যাটের আওতামুক্ত বা কমিয়ে আনার প্রস্তাব করার ফলে মোবাইল ফোনের সেট, আমদানীকৃত কাগজ, চিনি, মিষ্টিজাত পণ্য, বিস্কুট, চকলেট, সিআর কয়েল, টাইলস, কৃষি ও হাঁস-মুরগী, গবাদিপশু খামারের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতির মূল্য কমতে পারে। এছাড়া কোমল পানীয়, কনডেন্সড মিল্ক, সুতা বুনন ও বস্ত্র বয়ন শিল্পজাত পণ্য, সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে আবশ্যিক যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হাসপাতালের চিকিৎসা ও জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম এবং অপরিশোধিত তেল জ্বালানীর মূল্যও কমতে পারে।

মূল্য সংযোজন কর হ'তে অব্যাহতি দেয়ার প্রস্তাব করায় জীবন্ত গবাদি পশু, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, জীবন্ত পাখি, গবাদি পশুর গোশত (তাজা বা ঠাণ্ডা), শুকনা মাছ, লবণাক্ত মাছ, দুধ, চিনি, ননী, প্রাকৃতিক মধু, পাখির ডিম, হাতির দাঁত, কচ্ছপের খোলক, তিমির চোয়াল, হরিণের শিং, প্রবাল, গাজর, শালগম, শসা, শাক-সবজি, কাজুবাদাম, নারিকেল, কলা, আঙ্গুর, তরমুজ, আপেল, নাশপাতি, গোলমরিচ, দারুচিনি, আদা, জাফরান, হলুদ প্রভৃতির মূল্য কমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। বীমা শিপিং এজেন্ট ও সিএণ্ডএফ এজেন্টের কমিশনের উপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহার করার প্রস্তাবে এসব খাতে ব্যবসায়ীদের ব্যয়ের পরিমাণ কমতে পারে।

প্রতিক্রিয়াঃ

নতুন অর্থ বছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটকে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ, ব্যাংক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন, ফ্রোজেন ফুডস এসোসিয়েশন, এগ্রোপ্রোসেসরস এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস ওনার্স এসোসিয়েশন সহ বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদল উন্নয়নমুখী ও বলিষ্ঠ বাজেট হিসাবে উল্লেখ করে বলেছে, এ বাজেট দেশের অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা হ্রাস, দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রামমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের ঐকান্তিক প্রয়াসের স্বাক্ষর বহন করে।

অপরদিকে আওয়ামীলীগ ও তার অঙ্গসংগঠন সমূহ বাজেটকে গণবিরোধী, শিল্প, শ্রমিক ধ্বংসকারী, শিক্ষাবিরোধী ও গরীব মারার এ বাজেট বলে বাজেট প্রত্যাখ্যান করেছে।

[দলীয় রাজনীতির চিরকালীন নিয়ম অনুযায়ী সরকারী দল বাজেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং বিরোধী দল বাজেটের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত। ফলে বাজেট আসলেই কল্যাণমুখী না অকল্যাণমুখী তা রাজনীতিকদের কাছ থেকে এবং তাদের অনুসারী অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকেও জানার উপায় নেই। তবুও আমরা সরকারের কল্যাণ চিন্তার প্রতি সুধারণা রাখছি। আমাদের বক্তব্য সম্পাদকীয়তে বিবৃত হ'ল (স.স)]

বিদেশ

এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম বাঙ্গালী

ভারতীয় নৌবাহিনীর এক অফিসার লেঃ কমাণ্ডার সত্যব্রত ধাম (৩৭) প্রথম বাঙ্গালী হিসাবে এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। গত ১৯ মে দুপুর নাগাদ ভারতীয় নৌবাহিনীর এক অভিযাত্রী দল চীনের দিক থেকে রওয়ানা হয়ে এই সাফল্য অর্জন করে। লেঃ ধাম ছিলেন এই অভিযাত্রী দলের নেতা। চলতি বসন্তে কমাণ্ডার অমিত পান্ডেসহ ১৩ জন নৌবাহিনী কর্মী এবং ৯ জন শেরপাকে নিয়ে লেঃ কমাণ্ডার ধাম অভিযান শুরু করেন। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে দু'সপ্তাহ ধরে বেস ক্যাম্প থেকে রওয়ানা হয়েও ফিরে আসতে হয় এই অভিযাত্রী দলকে। অবশেষে ১৯ মে স্থানীয় সময় সকাল ১১ টা ৪০ মিনিটে তারা সফল হন। প্রথম বাঙ্গালী হিসাবে বিশ্বের উচ্চতম শৃঙ্গ জয়ের কৃতিত্ব কমাণ্ডার ধাম এমন সময় অর্জন করলেন, যখন বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছিল এভারেস্ট জয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী। উল্লেখ্য যে, এভারেস্ট অভিযানে যাওয়ার আগে লেঃ কমাণ্ডার ধাম হিমালয়ের ২৯টি পর্বত শৃঙ্গে অভিযান করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে হিজাব পরায় মহিলা কর্মী চাকুরিচ্যুত

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় আয়েশা বাহা (৩২) নাম্নী এক মুসলিম মহিলা মাথায় স্কার্ফ পরে কর্মে যোগদান করায় তাকে চাকরি হারাতে হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত ওয়াল্ড ডিজনিল্যান্ডে এ ঘটনা ঘটেছে। মহিলা তার নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে অরল্যান্ডোর ফেডারেল কোর্টে মামলা করেছেন এবং কোর্ট এ ব্যাপারে ঐ কোম্পানীর উপর নোটিশ ইস্যু করেছে।

আয়েশা বাহা ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০২ সালের মধ্য আগস্ট পর্যন্ত ওয়াল্ড ডিজনিল্যাণ্ডে কর্মরত ছিলেন। ২০০২ সালে মেটার্নিটি লীভ (মাতৃত্বজনিত ছুটি) নেওয়ার পর থেকে তিনি হিজাব পরা শুরু করেন। তিনি বলেন, এ সময় তার ধর্মের প্রতি বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। ফলে তিনি গুরুত্বের সাথে তার ধর্মের বিধান পালন করা শুরু করেন। এমতাবস্থায় তিনি হিজাব পরে তার কর্মে যোগ দিতে গেলে তাকে হিজাব খুলে ফেলার জন্য বলা হয়। তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে কর্মচ্যুত করা হয়।

ফ্রান্সে পৃথিবীর সর্বোচ্চ সেতু

পৃথিবীর সর্বোচ্চ সেতুটি এখন ফ্রান্সে নির্মাণাধীন। এর নাম 'মিলাউ সেতু'। এটি সংযুক্ত করবে ফ্রান্সের রেড কম ও লারজাক অঞ্চলকে। মিলাউ সেতু ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অবস্থিত আইফেল টাওয়ার থেকেও ২৩ মিটার উঁচু। বাইরে থেকে দেখলে এত উঁচু সেতুর উপর দিয়ে চলাচল অনেকটা বিপজ্জনক মনে হ'লেও সেতুর উপর গেলে ব্যাপারটা মনে হবে সচরাচর ও স্বাভাবিক।

মায়ানমারের সেনাবাহিনী থেকে শিশু সৈনিক অপসারণের আহ্বান

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি মানবাধিকার সংস্থা মায়ানমারের সেনাবাহিনী থেকে অবিলম্বে শিশু সৈনিকদের অপসারণের জন্য সে দেশের সামরিক সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। জাতিসংঘের একটি প্যানেল দেখতে পেয়েছে যে, দেশটিতে আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করতে কম বয়সীদের নিয়োগ দানের প্রথা ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে। নিউইয়র্কের হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, বর্তমানে মায়ানমারের সেনাবাহিনীতে সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালনরত সৈনিকদের মধ্যে ২০ শতাংশেরও বেশী ১৮ বছরের কম বয়সী। মায়ানমারের সেনাবাহিনীতে সাড়ে তিন লাখ সৈন্য রয়েছে এবং উপরোক্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই দেশটিতেই বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শিশু সৈনিক কর্মরত। ২৯ মে এক বিবৃতিতে 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচে'র পক্ষ থেকে বলা হয়, মায়ানমারের শিশুদেরকে সৈনিক হিসাবে ব্যবহার কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। এদিকে মায়ানমারের সামরিক বাহিনী শিশুদেরকে সৈনিক হিসাবে নিয়োগ দানের অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

মাতৃগর্ভ থেকে সন্তান চুরি

কলম্বিয়ায় ৮ মাসের গর্ভবতী এক মায়ের গর্ভ থেকে সন্তান চুরি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্র জানায়, চুরি হওয়া শিশুটিকে পাওয়া গেছে এবং তাকে মায়ের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে। অপরাধীকেও আটক করা হয়েছে।

গর্ভবতী ঐ মহিলা জানান, এক মহিলা তার পেটের সন্তানের জন্য কিছু কাপড় দেওয়ার প্রস্তাব করে এবং একই সঙ্গে তাকে কিছু পান করতে বলে। মহিলা কিছু না ভেবেই তা পান করে ফেলে। পান করার পর তার দু'চোখ ভারী ঘুমে জড়িয়ে পড়ে। রাজধানী বোগোটা থেকে ১৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে গিরারডট শহরের কাছে এক জঙ্গলে এক পর্যায়ে তার জ্ঞান ফিরে আসে। তিনি তার পেটে হাত দিয়ে দেখতে পান, সেখানে শিশুটি নেই। পেট খালি। হঠাৎ তিনি বাচ্চার কান্নার শব্দ শুনতে পান এবং ঝাপসা চোখে দেখেন ঐ মহিলা শিশুটিকে কাপড়ে জড়িয়ে চলে যাচ্ছে। অপারেশনের কারণে তখন মায়ের পেট থেকে রক্তপাত হচ্ছিল। তবুও তিনি পুলিশকে খবর দিতে সক্ষম হন এবং পুলিশ বাচ্চাসহ অপরাধীকে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানায়, বাচ্চাসহ অসুস্থ মাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়া হয় এবং অপরাধীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

মুসলিম জাহান

গাযী ইওয়ার ইরাকের অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্টঃ ২৬ সদস্যের নয়া মন্ত্রীসভা

ইরাকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দখলদার বাহিনীর ইচ্ছা ব্যর্থ করে দিয়ে গভর্ণিং কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে এ কাউন্সিলের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ৪৫ বছর বয়স্ক সুন্নী মুসলমান গাযী মাসেল আজিল আল-ইওয়ারকে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিয়োগ দিয়েছে। ইরাকে অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভার ২৬ জন সদস্যের নামও ঘোষণা করা হয়েছে।

গত মে মাসের মাঝামাঝিতে গভর্ণিং কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ইজ্জেদীন সালিম আত্মঘাতী হামলায় নিহত হওয়ার পর গাযী ইওয়ার কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। ৩০ জুন থেকে তার এ মনোনয়ন কার্যকর এবং ১ জুলাই অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করার কথা। এদিকে গত ১ জুন ২২ সদস্যবিশিষ্ট গভর্নিং কাউন্সিল বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য যে, গাযী ইওয়ার ইরাকের শী'আ ও সুন্নী উভয় গোত্রেরই পসন্দের একজন ব্যক্তি। তিনি সঊদী আরবের পেট্রোলিয়াম ও মিনারেল ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক ডিগ্রী এবং যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ টাউন ইউনিভার্সিটি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট গাযী ইওয়ার এক টিভি সাক্ষাৎকারে ইরাকে মার্কিন দখলদারিত্বের সমালোচনা করেন এবং আইন-শৃংখলার অবনতির জন্য দখলদার কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতাকে দায়ী করেন।

সিরিয়ায় নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার

মধ্য সিরিয়ায় সম্প্রতি একটি বড় ধরনের গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ক্রোয়েশিয়ান আইএনএ তেল ও গ্যাস কোম্পানী এই গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। এর ফলে সিরিয়া এই প্রথমবারের মত গ্যাস রফতানী করতে পারবে। গত ২০ মে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিরিয়ার তেলমন্ত্রী ইবরাহীম হাদদাদ একথা বলেন।

দামাস্কাস থেকে প্রায় ২৩৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এই গ্যাস ক্ষেত্র অবস্থিত। এই গ্যাস ক্ষেত্রটি ৪৮০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বিস্তৃত। এখানে প্রায় ১৫০০ কোটি কিউবিক মিটার গ্যাস মওজুদ রয়েছে। সিরিয়ার বর্তমান প্রতিদিন গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে ২ কোটি ৪০ ঘনমিটার, যা দেশে ব্যবহৃত হয়। এই নতুন গ্যাস ক্ষেত্র থেকে প্রতিদিন ১ কোটি ঘনমিটার গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

ইন্দোনেশিয়ায় প্রচণ্ড অগ্নুৎপাতঃ নিহত ২

ইন্দোনেশিয়ায় দু'টি পৃথক আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতে ও লাভা উদগীরণে উৎকীর্ণ পাথরের আঘাতে ২ ব্যক্তি নিহত ও অন্য ৭ জন আহত হয়েছে। ২০ হাযার লোককে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। উত্তরাঞ্চলীয় একটি গ্রাম তপ্ত ছাই ও কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সুলাসির উত্তরের ছোট্ট ছোট্ট বহু দ্বীপ নিয়ে গঠিত স্যাংগিহি দ্বীপের অগ্নুৎপাত অবলোকন কেন্দ্রের কর্মকর্তা জানান, আউ পর্বতের চূড়া থেকে বাতাসে গরম ছাঁই সমেত ধোঁয়ার কুণ্ডলী গ্রামময় ছড়িয়ে পড়ে। তবে বিপজ্জনক এলাকা থেকে লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আউ পর্বতে সর্বশেষ ১৯৯২ সালে লাভা ছড়ায়। তবে তাতে ভয়াবহ কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কিন্তু ১৯৬৬ সালের আগস্টের লাভা উদগীরণের ঘটনায় ৩৯ ব্যক্তি নিহত হয় এবং হাযার হাযার লোক পালিয়ে যায়।

ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন

আকমালুদ্দীন ইহসান নতুন মহাসচিব

গত ১৫ জুন সোমবার তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে ৫৭ সদস্য বিশিষ্ট ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-এর ২ দিন ব্যাপী ৩১ তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন সমাপ্ত হয়। পূর্ব নির্ধারিত এজেন্ডা মহাসচিব পদে নির্বাচন ছিল এবারের সম্মেলনের প্রধান আকর্ষণ। বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও তুরস্ক ওআইসির এই সর্বোচ্চ পদটির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠার পর থেকে সব সময়ই পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতেই 'ওআইসি' মহাসচিব মনোনীত হয়ে আসছে। কিন্তু এবার বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও তুরস্ক কোন দেশই প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে রাজি না হওয়ায় 'ওআইসি' প্রতিষ্ঠার প্রায় চার দশকের ইতিহাসে এবারই প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যগত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ছালাউদ্দীন কাদের চৌধুরী এমপি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নেন। নির্বাচনে তুরস্কের আকমালুদ্দীন ইহসান (৬১) মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি একজন ইতিহাসবিদ। তিনি বর্তমান মহাসচিব মরক্কোর আবদুল ওয়াহেদ বেলকেজিজের স্থলাভিষিক্ত হ'লেন। বর্তমান মহাসচিবের চার বছরের মেয়াদ এ বছর ডিসেম্বর মাসে শেষ হবে।

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

আমরা ভুলে যাই কেন?

মাথার মধ্যে 'মিউরণ' (Muron) হচ্ছে সব রকম স্মৃতি ধরে রাখার মত জায়গা। এ 'মিউরণ' স্মৃতি গুছিয়ে রাখে এবং যখন যা মনে হওয়া দরকার, তা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, আমাদের জানা জিনিসটি ভুলে যাই। এর কারণও কিন্তু 'মিউরণ' অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থার গরমিল হ'লে 'মিউরণ'-এর কাজে গরমিল দেখা দেয়। ফলে আমরাও ভুলে যাই।

কলার গুণাগুণ!

কর্মক্লান্ত দিন শেষে হারানো শক্তি ফিরে পেতে একটি কলা খাওয়ার কোন বিকল্প নেই। সর্বশেষ এক গবেষণায় একথা জানা যায়। গবেষণার ফলাফলে জানা যায়, দিনে একটি করে কলা ভক্ষণ ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে ইনশাআল্লাহ। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, এক নাগাড়ে ৯০ মিনিট কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত শক্তি যোগাতে দু'টি কলাই যথেষ্ট। শুধু শক্তি যোগানোই নয়, বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতা থেকে আরোগ্য সহায়তা অথবা রোগ ঠেকাতে কলা ভূমিকা রাখতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে, প্রতিদিনের খাবার তালিকায় অবশ্যই কলা যুক্ত করতে হবে। কলায় উচ্চ পর্যায়ে আয়রণ থাকায় রক্তে হিমোগ্লবিন বৃদ্ধি পায় এবং রক্তস্বল্পতা রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এমনকি উচ্চ রক্তচাপ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতেও কলা অনন্য।

খাবার লবণ আহরণ করা হয় কিভাবে?

জোয়ারের সময় সমুদ্রের লবণাক্ত পানি খালের মত একটি সুক্ষ্ম পথ দিয়ে চারদিকে পাড় বাঁধা একটি প্রশস্ত স্থানে প্রবেশ করানো হয়। কখনও আবার স্যালো মেশিনের সাহায্যেও পানি প্রবেশ করানো হয়। ঐ স্থানটি পানি দ্বারা পরিপূর্ণ হ'লে খালের মুখটি বন্ধ করে দেয়া হয়। এরূপে জমানো পানি দীর্ঘদিন ধরে সূর্যতাপের সাহায্যে বাষ্পীভূত হ'তে থাকে। পানি সম্পূর্ণরূপে বাষ্পীভূত হয়ে যাওয়ার পর লবণ নীচে জমে যায়। এভাবেই সমুদ্রের পানি থেকে লবণ পাওয়া যায়।

গরমের দিনে বড় গাছতলা ঠাণ্ডা হয় কেন?

গাছ পাতার সাহায্যে খাদ্য তৈরী করে। আর খাদ্য তৈরী করতে পানির দরকার। গাছ পানি চুষে মূল দিয়ে। গাছের যতটুকু পানি দরকার ততটুকু সে কাজে লাগায়। অবশিষ্ট পানি পাতার অসংখ্য ছিদ্র দিয়ে বাষ্প হয়ে বেরিয়ে আসে। ফলে বাতাসে পানি-কণার ভাগ বা আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়ে। এতে ওখানকার বাতাসের তাপমাত্রা কমে যায়। বড় বড় গাছে অনেক পাতা থাকে বলে বেরিয়ে আসা জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশী হয়। সেই জলীয় বাষ্পে গাছ ঠাণ্ডা হয়। তাছাড়া বড় বড় গাছের পাতা গাছের তলায় যে ছায়া তৈরী করে, তাও মাথার উপরে ছাতার মত কাজ করে।

মানুষের মুখমণ্ডল ট্রান্সপ্লান্ট বিজ্ঞানের নতুন চিন্তা

মানুষের কিডনী, বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থি এবং লিভার বা যকৃত এক জনের দেহ থেকে আরেকজনের শরীরে সংস্থাপন করা এখন আর নতুন কোন ব্যাপার নয়। মার্কিন বিজ্ঞানীরা এখন মানুষের সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল সংস্থাপন করতে চাইছেন। তারা নাক-মুখ, চোখ-কান সবসুদ্ধ মুখমণ্ডল সংস্থাপন বা ট্রান্সপ্লান্ট করতে চাইছেন। শুনতে এটা অবাক লাগলেও মার্কিন বিজ্ঞানীরা সেটা করতে চাইছেন। বিশ্বের সর্বপ্রথম এ ধরনের অপারেশন করার জন্য তারা অনুমতি চাইছেন। কেন্টাকি অঙ্গরাজ্যের লুইসফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শল্য চিকিৎসকরা বলেছেন, দুর্ঘটনা বা কোন কারণে মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে গেলে, মৃত কোন মানুষের মুখমণ্ডল তার দেহে কিভাবে সংস্থাপন করতে হয় সে বিষয়ে তাত্ত্বিক জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন জানিয়েছেন। সেই অনুমতি পেলে তারা ডোনার বা দাতা ও রোগী খুঁজতে শুরু করবেন। এই সংস্থাপন প্রক্রিয়ায় মৃত কোন দাতার সম্ভাব্য রোগীর রক্তবাহী শিরা-উপশিরা, স্নায়ু, পেশী, চর্বি এবং ত্বক জুড়ে দিতে হবে। লুইসফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান শল্য চিকিৎসক ডঃ জন বার্কার মনে করেন, এটা বর্তমানের চেয়ে বেশী কঠিন নয়। তিনি আরো বলেন, কারো মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে গেলে বর্তমানে যে প্রক্রিয়া ব্যবহার করে আগের চেহারা দিতে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে, ঐ ব্যক্তির নিজের শরীরের এক জায়গা থেকে টিস্যু বা কোষকলা নিয়ে তার শরীরের অন্য জায়গায় বসানো হয়। মুখমণ্ডলে এভাবে টিস্যু ট্রান্সপ্লান্ট বা সংস্থাপন করার পর বেশ কয়েক বছর ঐ টিস্যুর উপর আরো অনেক কাজ করতে হয়, যাতে করে তা স্বাভাবিক দেখায় ও স্বাভাবিকভাবে কাজ করে। বিকৃত মুখমণ্ডল ঠিক করার জন্য বর্তমানে আমরা ঐ ব্যক্তির পা কিংবা পশ্চাৎ দেশের হাড় ব্যবহার করে গালের হাড় বা চোয়াল বানাই।

তিনি বলেন, এটা খুবই সহজ, প্রাকৃতিক ভাবে আমরা লোকজনকে তাদের মুখমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে থাকি। দেহের যেকোন অঙ্গের চেয়ে আমাদের মুখমণ্ডলের সাথে আমাদের চেহারার, আমাদের আদলের বন্ধন এবং আমাদের পরিচয়ের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অন্য যে কোন অঙ্গের চেয়ে হাযারগুণ বেশী। তবে মুখমণ্ডল সফলভাবে সংস্থাপনের অনুমতি মিলবে কি-না, মিললে শল্য চিকিৎসকরা তা সফলভাবে সংস্থাপন করতে পারবেন কি-না এবং তা পারলেও রোগীর উপর তা কেমন মানসিক প্রভাব সৃষ্টি করবে এ ধরনের বহু প্রশ্নের জবাব পাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিজ্ঞানীরাও অধীর।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন

আসুন! আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করি

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

লালমণিরহাট, ১৪ই মে শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে স্থানীয় মহিষখোচা বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ ময়দানে যেলা সম্মেলন ২০০৪ অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমরা প্রতি মুহূর্তে দুনিয়ার পিছনে ছুটে চলেছি। অথচ আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয়ে ব্যর্থ হচ্ছি। আসুন! আমরা আমাদের দুনিয়াকে আখেরাতের স্বার্থে ব্যবহার করি। আমাদের আমলগুলিকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিশুদ্ধ করে নিই। কেননা শিরক বিমুক্ত তাওহীদ বিশ্বাস, ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী বিশুদ্ধ আমল এবং ইখলাছে নিয়ত ব্যতীত আমাদের কোন আমলই আল্লাহ্র নিকটে কবুল হবে না। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সর্বদা মানুষকে সেদিকেই আহ্বান জানায়।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক ও দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, লালমণিরহাট যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা মুন্তাযির রহমান প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা' শিল্পী মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকঃ সম্মেলন শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মপরিষদ সদস্যদের সাথে এক বিশেষ দায়িত্বশীল বৈঠকে মিলিত হন। এ সময় তিনি যেলা দায়িত্বশীলগণের স্ব-স্ব দায়িত্বের তদারকী করেন এবং গঠনতান্ত্রিক নিয়মে জোরালো ভাবে আন্দোলনের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে অহি-র বিধান মেনে চলুন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

সাতক্ষীরা, ২৮ মে শুক্রবারঃ অদ্য যেলার ঐতিহ্যবাহী চিলড্রেন্স পার্কে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলা কর্তৃক আয়োজিত বিশাল ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যাওয়ার আন্দোলনকেই আহলেহাদীছ আন্দোলন বলা হয়। ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা এ নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনকে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজানোর আহ্বান জানায়। এ আন্দোলন চায় এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ, থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।

তিনি 'আহলেহাদীছ'-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহলের সাম্প্রতিক অপপ্রচার সমূহের তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, বিরোধীদের জেনে রাখা উচিত যে, 'আমরা প্রথমে আহলেহাদীছ, অতঃপর মুসলমান'। আমরা জীবন দিতে প্রস্তুত, কিন্তু কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ছাড়তে প্রস্তুত নই। কয়েকটি বামপন্থী পত্রিকায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-কে জঙ্গী ও তাদের আমীরকে জঙ্গীদের মূল নেতা হিসাবে চিত্রিত করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তিনি হুঁশিয়ার করে দেন এবং এইসব মিথ্যাচারী ও চরিত্র হননকারী সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে কঠোর জবাবদিহীতা ও বাধ্যবাধতা আরোপের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, এদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কুৎসা রটনায় বিভ্রান্ত হবেন না এবং দেশপ্রেমিক সংগঠন ও তাদের নেতাদেরকে আপনারা অন্যের চাপে বা প্ররোচনায় অহেতুক দূরে ঠেলে দিবেন না। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাষায় বলেন, এদেশে আল্লাহদ্রোহী নাস্তিকেরা কথা বলবে, শিরক ও বিদ'আতের শিখণ্ডীরা আস্ফালন করবে, আর পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী ও তাদের নেতাদের কথা বলতে বাধা দেওয়া হবে, এটা কখনোই বরদাশত করা হবে না। পরিশেষে তিনি দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজানোর জন্য জোট সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যেলা সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও

চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, কলারোয়া সরকারী কলেজের সাবেক অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম ও সুধীবৃন্দ।

সম্মেলনে যেলার প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ও পার্শ্ববর্তী যশোর যেলা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী রিজার্ভ বাসে এসে যোগদান করেন।

মহিলা সমাবেশঃ সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত স্থানীয় অডিটোরিয়ামে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ডঃ মুছলেহুদ্দীন মা-বোনদেরকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর পতাকাতলে জামা'আতবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। উক্ত সমাবেশে প্রায় চার শতাধিক মহিলা যোগদান করেন। উভয় সম্মেলনে জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা' শিল্পী জনাব শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

আহলেহাদীছ আন্দোলনকে বুঝতে চেষ্টা করুন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

শরীফপুর, গাযীপুর, ২০শে মে বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাযীপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শরীফপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা সভাপতি মাওলানা রফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারী মাওলানা কফীলুদ্দীন ইবনে আমীন-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** দেশের চিন্তাশীল উলামা ও সুধীবৃন্দের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা বা জাতীয়তাবাদ নয় বরং ইসলামই মানবতার মুক্তি সনদ। আর ইসলামের সঠিক রূপ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই হ'ল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। যা ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসছে জোয়ার-ভাটার গতিতে। তিনি বলেন, শিরক ও বিদ'আত যুক্ত বা তার সঙ্গে আপোষকারী আন্দোলন কখনোই প্রকৃত অর্থে ইসলামী আন্দোলন নয়। তিনি দেশের আইন ও শাসনব্যবস্থা এবং সমাজব্যবস্থাকে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধানের আলোকে গড়ে তোলার সংগ্রামে শরীক হওয়ার জন্য সর্বস্তরের জনগণ ও সুধী সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

সুধী সমাবেশের বিশেষ অতিথি 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন স্বীয় ভাষণে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আহলেহাদীছ আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব আলাউদ্দীন সরকার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব আব্দুল ওয়াদূদ প্রমুখ।

আসুন! হাবলুল্লাহকে ঐক্যবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধরি

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

পাঁচদোনা বাজার, নরসিংদী, ২১ মে শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক বিশেষ কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা কাযী আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে ও অধ্যাপক শফিউদ্দীন আহমাদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর ভাষণে বলেন, অসংখ্য মাযহাব ও তরীকায় বিভক্ত মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটাই মাত্র পথ রয়েছে, আর সেটি হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। এ পথের একমাত্র ঠিকানা জান্নাত। যে পথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সবাইকে আহ্বান জানিয়ে থাকে। মানুষের আবিষ্কৃত বিভিন্ন মত ও পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পথে ফিরে আসার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি 'আব্দুল্লাহ' নয় বরং 'হাবলুল্লাহ'-কে সমবেতভাবে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে মুসলিম ঐক্য পুনরুদ্ধারের জন্য উলামা ও সুধী সমাজের প্রতি আকুল আহ্বান জানান।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, নরসিংদী জামে'আ কাছেমিয়া মাদরাসার আরবী প্রভাষক মাওলানা নাজমুল ইসলাম প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম।

যেকোন মূল্যে 'আন্দোলনকে যোরদার করুন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

খুলনা, ২৮শে মে শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০ ঘটিকায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খুলনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মহানগরীর গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের জন্য সময়, শ্রম, অর্থ ও মেধা ব্যয় করার লোক দিন দিন কমে যাচ্ছে। তিনি সবকিছু ভুলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনে যোগদার করার আহ্বান জানান।

সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

মসজিদগুলিকে তারবিয়াতের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলুন

-জুম'আর খুৎবায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত

গোবরচাকা, খুলনা, ২৮ মে, শুক্রবারঃ অদ্য দুপুর ১২.৩০মিঃ গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে মুহতারাম আমীরে জামা'আত জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। এ সময়ে তিনি সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেন, দ্বীন কায়েমের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা যরূরী। এজন্য আপোষহীন বক্তব্য ও যোরদার লেখনীর সাথে সাথে প্রয়োজন সর্বত্র যোগ্য নেতা ও নিবেদিত প্রাণ কর্মীবাহিনী। আর এজন্য নিয়মিত প্রচেষ্টা ও পরিচর্যা আবশ্যক। তিনি 'আহলেহাদীছ' জামা'আতের মসজিদগুলিকে নিয়মিত তা'লীম ও তারবিয়াতের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

যুবসংঘ

কর্মী প্রশিক্ষণ

গাংণী, মেহেরপুর, ১ ও ২ জুন মঙ্গল ও বুধবারঃ স্থানীয় বায়তুল আমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি তারীকুযযামান-এর সভাপতিত্বে দু'দিনব্যাপী এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলা কর্তৃক আয়োজিত কর্মী প্রশিক্ষণ প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়া। প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ, গাংণী মহিলা ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক মুহাম্মাদ ইসহাক আলী প্রমুখ।

বুড়িচং, কুমিল্লা, ২৮ ও ২৯ মে, শুক্রবারঃ অদ্য বুড়িচং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর যৌথ উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি জনাব মাওলানা ছফিউল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আলহাজ্জ রুসমত আলী, যেলা যুবসংঘের সাবেক সভাপতি জনাব আহমাদ হোসায়েন বি,এস-সি 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উক্ত কর্মী সমাবেশে প্রশিক্ষণ দান করেন।

'আন্দোলন' পরিচালিত মাদরাসা সমূহের দাখিল'০৪ পরীক্ষার ফলাফল

১. **নওদাপাড়া, রাজশাহীঃ** বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্ররা শতকরা ১০০ ভাগ পাশ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। ২৯ জন পরীক্ষার্থীর সকলেই উত্তীর্ণ হয়েছে। এদের মধ্যে ৬ জন A+ অর্থাৎ জিপিএ-৫ ২১ জন A এবং ২ জন A- গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এবারের পরীক্ষার্থীদের চতুর্থ বিষয়ের নম্বর যোগ হয়েছে। কিন্তু গতবারের পরীক্ষার্থী যারা এবারে মান উন্নয়ন পরীক্ষা দিয়েছে, তাদের চতুর্থ বিষয়ের নম্বর যোগ হয়নি। নইলে ৭ জন মান উন্নয়ন পরীক্ষার্থীর অধিকাংশই A+ পেত এবং জিপিএ-৫-এর সংখ্যা আরো বেড়ে যেত।

২. **বাঁকাল, সাতক্ষীরাঃ** দারুল হাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা-র ছাত্ররা এবারের দাখিল পরীক্ষায় শতকরা ১০০ ভাগ পাশ করে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল করেছে। মোট ১৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ জন A+, ৬ জন A, ৩ জন A-, ৩ জন B ও ১ জন C গ্রেড লাভ করেছে।

পাঠকের মতামত

আহাজারীরত স্বজনদের দৃষ্টি ঢেউয়ের দিকে

ঢেউয়ের তালে তালে লাশ ভাসছে কি-না সেদিকেই দৃষ্টি স্বজনদের। মেঘ কেটে গেলেও বাতাসকে ভারী করছে লঞ্চ ডুবীতে নিহতদের হতভাগা স্বজনদের কান্না। লাশের সংখ্যা বাড়ছে। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, আর কতদিন এভাবে ঢেউয়ের দিকে তাকাতে হবে এদেশের নদীপথে চলাচলকারী মানব সন্তানদের? এ প্রশ্ন নিয়েই মতামত সম্বলিত আজকের এই ছোট্ট কলাম।

যে মেঘ থেকে ঝড়-বৃষ্টি, সে মেঘ কেটে গেছে। মেঘের গর্জনও নেই। কিন্তু মেঘ কেটে গেলেও মেঘনা পারের বাতাসকে ভারী করেছে গত ২২ মে রাতে মেঘনায় লঞ্চ ডুবীতে নিহতদের হতভাগা স্বজনদের কান্না। হৃদয় বিদারক কান্নায় চোখের জলে পরিধেয় জামা-কাপড় ভিজছে আবার শুকাচ্ছে, আবার ভিজছে। কিন্তু দৃষ্টি নড়চড় হচ্ছে না কারোরই। ঢেউয়ের তালে তালে লাশ ভাসছে কি-না সেদিকেই দৃষ্টি স্বজনদের।

এবারের মত বিগত দিনেও লঞ্চ ডুবেছে। মানুষ মরেছে। যাত্রীদের স্বজনরা এভাবেই ডুকরে ডুকরে কেঁদেছেন, চাতক পাখীর মত চেয়ে থেকেছেন দূরে ঢেউয়ের দিকে। তদন্ত কমিটি হয়েছে, তারা কিছু কিছু বিষয় সুপারিশও করেছে। কাজের কাজ কতটা হয়েছে, তা ২২ মে শনিবারের রাতে চাঁদপুরের কাছে মেঘনায় ৪টি লঞ্চ ডুবীর ঘটনাই বলে দিচ্ছে। বিশেষতঃ মাদারীপুরের স্বজনহারারা অশ্রুজলে হিসাব-নিকাশ করছেন।

বিগত দু'বছরে ১২টা লঞ্চ দুর্ঘটনায় নিহত দেড় হাযার মানুষের মধ্যে ২০০২ সালের তিনটা লঞ্চ ডুবির ঘটনায় প্রায় চারশ' মানুষ এবং ২০০৩ সালের সাতটা লঞ্চ ডুবির ঘটনায় প্রায় সহস্রাধিক মানব সন্তান তাদের অমূল্য প্রাণ হারায়। তন্মধ্যে ২০০৩ সালের ৮ জুলাই রাতে চাঁদপুরের অদূরে মেঘনার মোহনায় লঞ্চ ডুবিতে প্রায় ৮শ' মানব প্রাণের সলিল সমাধি ঘটে। যা নিয়ে সারাদেশে তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়। এদিকে নৌপরিবহন মন্ত্রী সদরঘাট টার্মিনালের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অন্যত্র বদলীর নির্দেশ দেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কিছুসংখ্যক কর্মকর্তাকে বদলীও করেন। অতঃপর কিছু লঞ্চকে অযোগ্য ঘোষণা সম্বলিত সুপারিশমালা ও বদলী আদেশ ধামাচাপা পড়ে যায়। ফলশ্রুতিতে মাদারীপুর থেকে ঢাকাগামী 'লাইটিং সান' এবং টরকী থেকে নারায়ণগঞ্জগামী 'দিগন্ত' ডুবে যায়।

এবারো তদন্ত হবে। প্রমাণিত হবে, অর্থলোভী লঞ্চ মালিক ও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে নিয়োজিত লঞ্চ পরিচালনায় নিয়োজিত সারেং সহ অন্যান্যদের যোগ্যতা-দক্ষতা ও দূরদর্শিতার অভাব। অর্থ রোজগারে অধিক যাত্রী নেয়া। এও প্রমাণিত হবে, লঞ্চগুলি যথানিয়মে চলাচলে অনুমতি পেতে পারে না। আবারও সুপারিশ হবে অধিক রাতে এবং ঝড় বৃষ্টির মুখে লঞ্চ চালানো যাবে না। একতলা বিশিষ্ট লঞ্চ ঝড় মৌসুমে চালানো নিষিদ্ধ ইত্যাদি। ক'দিন ঠিকঠাক চলতেও পারে। তারপর যে কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে, সে কারণ সমূহের বাস্তবতা দেখা যাবে। অথচ সন্তানহারা বাবা-মা সন্তানহারাই থেকে যাবেন। স্বামীহারা রমণী স্বামী হারানোর ব্যথায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জ্বলতেই থাকবেন। পিতৃ-মাতৃহারা সন্তানরা বাবা-মাকে হারিয়ে ইয়াতীম হবে। কেউ ভুল পথে যাবে ইত্যাদি।

উপরোক্ত বাস্তবতায় স্বজন হারাদের ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে। মানবতাবাদী কর্মীদের তাদের সাথে যোগ দিতে হবে। রাজনীতিকদের দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে স্বজন হারাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। দুর্ঘটনার কবলে আর যাতে পড়তে না হয়, এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় শোক প্রকাশ প্রহসনে পরিণত হবে। তাই প্রহসন নয়, মানুষের জীবনের নিরাপত্তাই হোক প্রধান বিষয়। অর্থলোভের কারণে লঞ্চডুবির সকল সম্ভাবনার ইতি টানা হোক। আমাদের সকল কর্ম হোক মানুষের কল্যাণে।

❖ *এস.কে. মজীদ মুকুল*
মহাসচিব, জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা।

ধন্যবাদ কেশব লাল শীল

আমি **'আত-তাহরীক'**-এর একজন নিয়মিত পাঠক। আমি 'পাঠকের মতামত' কলামে ইতিপূর্বে কিছু লিখিনি। কিন্তু হিন্দু ভাই 'কেশব লাল শীল'-এর (মে/০৪ সংখ্যা) লেখা 'বাংলা সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য প্রভাব' প্রবন্ধটি পড়ে যারপর নেই অভিভূত হয়েছি। তিনি হিন্দু হয়েও পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এভাবে কলম ধরবেন, তা কল্পনাও করতে পারিনি। দেশাভ্যন্তরে বিদেশী 'অপসংস্কৃতির' বিরুদ্ধে তিনি যে জোরালোভাবে প্রতিবাদ করেছেন, তাই তাকে 'ধন্যবাদ' না দিয়ে পারলাম না। আমাদের প্রিয় **'আত-তাহরীকে'** আগামীতে তিনি আরও কিছু উপহার দিবেন এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

❖ *আব্দুর রহমান বিন আবুবকর*
সোনাপুর, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

শুরুতেই গলদ!

মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই আমরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়েও অনেকে ইসলাম সম্পর্কে সামান্যই জানি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা যেটুকু পাই, সেটুকুও ভুলে ভরা। ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের প্রথমটাই হ'ল ঈমান। ঈমানের শুরুর কথা- আল্লাহতে বিশ্বাস। এতকাল কিংবা এখনো আমরা বইপত্র পড়ে জেনেছি বা জানছি 'আল্লাহ নিরাকার। তিনি সর্বত্র বিরাজমান'। আমার বাপ-দাদা যারা ঈমানের সাথে মৃত্যু কামনা করেছিলেন- তাঁরা আল্লাহ সম্পর্কে উক্ত ধারণা নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমরা কুরআনের সঠিক তরজমা-তাফসীর কিংবা ছহীহ হাদীছ খুঁজতে যাইনি। সহজপ্রাপ্য বাংলা দ্বীনিয়াত কিংবা আলেম (!) ছাহেবদের মুখনিঃসৃত ওয়ায-নছীহত শুনেই ইসলাম সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি। অথচ হায়! আল্লাহ সম্পর্কেই আমরা ভুল ধারণা পোষণ করে বসে আছি! সম্প্রতি আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের রচিত কিছু পুস্তিকা পড়ে জানতে পারি- আল্লাহ সাকার, তাঁর হাত, পা, চোখ, কান, হৃদয় আছে। তিনি আরশে সমাসীন। তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তাঁর ইল্‌ম ও কুদরত সর্বত্র বিরাজমান'। এই পুস্তিকা রচয়িতাগণ মনগড়া কথা বলেননি। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ স্বীয় অঙ্গগুলি সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন, তাই তুলে ধরেছেন। এসব আয়াতকে অস্বীকার করা আল্লাহকেই অস্বীকার করার নামান্তর। আমার মত অন্ধকে দৃষ্টিদান করার জন্য আহলেহাদীছ বিদ্বানগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

❖ *তারিক অনিকেত*
ঈদগাহ বাজার, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৩৬১)ঃ আমাদের ক্যাম্প থেকে কাজের স্থান ১০০ কিলোমিটার দূরে। সেখানে যোহরের ছালাত আদায় করে ক্যাম্পে ফিরে এসেও ছালাতের সময় থাকে। এমতাবস্থায় ছালাত ক্বছর হবে কি-না?

-সার্জেন্ট মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ
সি,এ,বি (ওকেপি-১)
বিএমসি টু কুয়েত
পুরাতন খাইত্বান, কুয়েত।

উত্তরঃ উক্ত ব্যক্তি কর্মের স্থানে ছালাতের সময় হ'লে ক্বছর করে ছালাত আদায় করে নিবেন। যদিও অত্যাধুনিক যানবাহনের মাধ্যমে ছালাতের ওয়াক্তের মধ্যেই বাসস্থানে পৌঁছা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(বুলূগুল মারাম হা/১৬৮ 'ছালাতের সময়' অনুচ্ছেদ)*। তবে সফরে ক্বছর করা বিষয়টি অপরিহার্য নয় বরং উত্তম। আল্লাহ বলেন, 'যখন তোমরা সফর কর, তখন তোমাদের ছালাতে ক্বছর করায় কোন দোষ নেই' *(নিসা ১০১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ এটিকে তোমাদের জন্য ছাদাক্বা হিসাবে প্রদান করেছেন। অতএব তোমরা তা গ্রহণ কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৩৫)*। ওছমান ও আয়েশা (রাঃ) প্রথম দিকে ক্বছর করতেন ও পরে পুরা পড়তেন। ইবনু ওমর (রাঃ) জামা'আতে পুরা পড়তেন ও একাকী ক্বছর করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৪৭-৪৮)*।

প্রশ্নঃ (২/৩৬২)ঃ কোন চিকিৎসক ভুলবশতঃ চিকিৎসা করার কারণে যদি রোগী মারা যায়, তাহ'লে কি ঐ চিকিৎসক অপরাধী হবেন?

-মুহাম্মাদ আবু মূসা
বড়তারা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক সুস্থ করার সদিচ্ছায় রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে যদি রোগী মারা যায়, তাহ'লে ঐ চিকিৎসক দায়ী হবেন না। আর যদি চিকিৎসক অনভিজ্ঞ হন এবং তার চিকিৎসা না জানার কারণে রোগী মারা যায়, তবে চিকিৎসক দায়ী হবেন। তাকে 'দিয়াত' বা রক্তমূল্য দিতে হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ 'যে ব্যক্তি চিকিৎসা করে, অথচ চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী নয়, সে (রোগীর জন্য) দায়ী হবে' *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, 'রক্তমূল্য' অধ্যায়, 'অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা' অনুচ্ছেদ নং ২৫, হা/৪৫৮৬)*। আমর ইবনু শু'আইব তার পিতা হ'তে, তিনি তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'যে ব্যক্তি চিকিৎসা করে অথচ সে চিকিৎসা বিদ্যায় অভিজ্ঞ নয়, তার কারণে যদি কোন রোগী মারা যায় অথবা রোগীর কোন ক্ষতি হয়, তাহ'লে ঐ চিকিৎসক দায়ী হবে' অর্থাৎ তাকে জরিমানা স্বরূপ 'রক্তমূল্য' দিতে হবে *(দারাকুৎনী, হাকেম হাদীছটিকে 'ছহীহ' বলেছেন, বুলূগুল মারাম হা/১১৮১ 'অপরাধ' অধ্যায় 'রক্তমূল্য' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩৬৩)ঃ আমার কোন পুত্র সন্তান নেই। ৯ জন মেধাবী কন্যা রয়েছে। তন্মধ্যে ৮ম কন্যা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় আমার অজ্ঞাতে স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীতে অফিসার পদে চাকুরী গ্রহণ করে। সে এখন চট্টগ্রামে ২ বৎসর মেয়াদী কোর্সে ট্রেনিং-এ আছে। ইতিমধ্যে ৯ মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। চাকুরী ছাড়ারও উপায় নেই। তার চুল মহিলা নাপিত দ্বারা কেটে ছোট করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তার এই চাকুরী গ্রহণ করা বৈধ হয়েছে কি? যদি না হয় তবে প্রতিকারের উপায় কি?

-মুহাম্মাদ আবদুস সাত্তার সরকার
গোপালপুর, নাটোর।

উত্তরঃ মহিলারা এ ধরনের চাকুরীতে কয়েকটি কারণে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। (এক) পর্দা, যা মেয়েদের জন্য ফরয *(নূর ৩১)*। (দুই) মেয়েদের জন্য সশস্ত্র জিহাদ নেই *(বুখারী ১/২০৬)*। (তিন) উক্ত চাকুরীর জন্য মাহরাম ছাড়াই বিভিন্ন স্থানে সফর করতে হবে, যা নিষিদ্ধ *(বুখারী, মিশকাত হা/২৫১৫)*। (চার) মহিলা হয়ে পুরুষের রূপ ধারণ করা *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৪২৯)*। (পাঁচ) পুরুষদের নিকটে ট্রেনিং নিতে হবে ও তাদের সাথে মিলেমিশে থাকতে হবে, যা হারাম। অতএব আপনার কর্তব্য হবে মেয়েকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করে চাকুরী থেকে ফিরিয়ে আনা এবং তাকে ভাল ছেলের সাথে বিবাহ দেওয়া।

প্রশ্নঃ (৪/৩৬৪)ঃ 'ছালাতুল আওয়াবীন' নামক নফল ছালাত কত রাক'আত, কত সালামে এবং কোন্ সময় পড়তে হয়? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহমূদুর রহমান
গ্রামঃ বানিসর, পোঃ বালু বাজার
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ মাগরিবের ছালাত শেষে অনেকের মধ্যে ৬ বা ২০ রাক'আত নফল ছালাত আদায়ের অভ্যাস দেখা যায়, এটাকে এদেশে 'ছালাতুল আওয়াবীন' বলা হয়। উক্ত মর্মে তিরমিযী বর্ণিত হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৭৩ 'সুন্নাত ছালাত সমূহের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। অতএব উক্ত ছালাত আদায় করা ঠিক নয়। তবে সূর্যোদয়ের পরে বেলা ১১-টার দিকে রৌদ্র গরম হ'লে যে চাশতের ছালাত আদায় করা হয়, উক্ত ছালাতকেই হাদীছে 'ছালাতুল আওয়াবীন'

বলা হয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১২, বাংলা মিশকাত হা/১২৩৭)*। কিন্তু সূর্যোদয়ের সাথে সাথে কেউ ইশরাক্বের ছালাত আদায় করলে তাকে আর ১১-টার দিকে চাশতের ছালাত আদায় করতে হবে না। যেকোন একটি পড়লেই চলবে। সময়ের ভিন্নতার কারণে নাম (ইশরাক্ব ও চাশত) দু'টি হয়েছে। মূলতঃ ছালাত একটিই এবং তার নাম 'ছালাতুল আওয়াবীন' অর্থাৎ 'আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনশীল বান্দাদের ছালাত'। যার রাক'আত সংখ্যা সর্বনিম্ন দুই ও সর্বোচ্চ আট *(মুসলিম, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩১১, ১৩০৯)*। উল্লেখ্য যে, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহতে বর্ণিত ১২ রাক'আতের হাদীছটি 'যঈফ' *(আলবানী, মিশকাত হা/১৩১৬)*।

প্রশ্নঃ (৫/৩৬৫)ঃ তিরমিযী ও আবূদাঊদের একটি হাদীছে আছে, তালাক, বিবাহ এবং রাজ'আত এই তিনটি বিষয়ে হাসি-ঠাট্টা করলে সেটা অবধারিত হয়ে যায়। হাদীছটি কি ছহীহ?

-ফাতেমা
হাজিটোলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লিখিত হাদীছটি মূলতঃ 'যঈফ' কিন্তু 'শাওয়াহেদ' থাকার কারণে শক্তিশালী অর্থাৎ 'হাসান' হিসাবে গৃহীত হয় *(তিরমিযী, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৩২৮৪; ইরওয়াউল গালীল, হা/১৮২৫)*। উক্ত হাদীছের সারকথা এই যে, বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়ের অলী যদি পাত্রের সাথে হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে নিজের মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় এবং পাত্র তাতে ঠাট্টার ছলেই রাযী হয়ে যায়, তাহ'লে উক্ত বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। তালাক ও রাজ'আতের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হবে। কেননা এগুলি হাসি-খেলার বিষয় নয়।

প্রশ্নঃ (৬/৩৬৬)ঃ কবর কত প্রকার এবং কোন্ প্রকার কবর উত্তম? মৃত ব্যক্তিকে কবরে কিভাবে রাখতে হয়? মৃতের দেহ এবং মুখমণ্ডল কোন্ দিকে রাখতে হয়?

-মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম
ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ কবর দু'প্রকার, 'লাহ্দ' ও 'শাক্ব' যাকে এদেশে যথাক্রমে 'পাশখুলি' ও 'বাক্স' কবর বলা হয়। তবে 'লাহ্দ' উত্তম। মাইয়েতকে কবরে রাখার সময় পায়ের দিক দিয়ে নামাবে। অসুবিধা হ'লে যেভাবে সহজ হয়, সেভাবে নামাবে। মাইয়েতের মাথা উত্তর দিকে থাকবে এবং তাকে একটু ডান কাতে ক্বিবলামুখী করে শোয়াবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৫৯; আলবানী, তালখীছু আহকামিল জানায়েয, পৃঃ ৫৮-৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৭/৩৬৭)ঃ আমাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা মোট আট জন। আমরা তিন বোন বর্তমানে স্বামীর বাড়ীতে আছি। এমতাবস্থায় আমার আব্বা শুধু তিন ভাইকে ১৪০ শতাংশ জমি সাফ কবলা করে দিয়েছেন। এতে আম্মা সহ আমরা তিন বোন এই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছি। বিষয়টি কতটুকু শরী'আত মোতাবেক হয়েছে?

-মা'রূফা আখতার
গ্রামঃ পুরিন্দা সরকার বাড়ী
পোঃ সাতগ্রাম, আড়াই হাজার
নারায়ণগঞ্জ।-১৬০৩

উত্তরঃ সম্পত্তির অন্যান্য অংশীদার থাকা অবস্থায় শুধু ছেলেদের নামে এভাবে সম্পত্তি দেয়া জায়েয নয়। এ বিষয়ে শরী'আতে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, আমার পিতা আমাকে একটি গোলাম দান করেন। তখন আমার মা বললেন, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সাক্ষী না রাখা পর্যন্ত আমি খুশী নই। অতঃপর তার পিতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে বললেন, আমার এ ছেলেকে আমি একটি গোলাম দান করেছি। কিন্তু তার মা আপনাকে এতে সাক্ষী রাখার জন্য বলেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কি তোমার সকল ছেলেকে এরূপভাবে দিয়েছ? সে উত্তরে বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহকে ভয় কর, তোমার ছেলেদের মাঝে ইনছাফ কর। আমি অন্যায় কাজের সাক্ষী থাকি না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১৯ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৭)*।

প্রশ্নঃ (৮/৩৬৮)ঃ আমি গত এক বছর ছালাত আদায় করিনি। সেই ছালাত আমি এখন ক্বাযা হিসাবে আদায় করছি। এই ক্বাযা ছালাত হবে কি? আমি হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ছালাত আদায় করি এবং ইমামের পিছনে তাকবীরে তাহরীমা করি। আমার এই তাকবীরে তাহরীমা নাকি ইমামকে এভয়েড করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় আমার ছালাত হচ্ছে কি?

-মুহাম্মাদ শাহাবুল ইসলাম
সিইপিজেড, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ উক্ত ছুটে যাওয়া ছালাত সমূহ আর ক্বাযা আদায় করতে হবে না। কারণ এরূপ ছুটে যাওয়া ছালাত ক্বাযা করার কোন বিধান শরী'আতে নেই। বরং নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে হবে এবং পূর্বের ছুটে যাওয়া ছালাতের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র নিকটে খালেছ অন্তরে তওবা করে ক্ষমা চাইতে হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ছুটে যাওয়া ছালাতের গোনাহ সমূহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ বলেন, 'বুলুন! হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপরে যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে থাকেন' *(যুমার ৫৩)*। এ বিষয়ে 'উমর ক্বাযা' বলে যে কথা চালু আছে, এটা সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত' *(মাসিক আত-তাহরীক ২য় বর্ষ, আগষ্ট '৯৯ প্রশ্নোত্তর ১৯/১৯৪)*।

ইমাম ও মুক্তাদী উভয়কেই তাকবীরে তাহরীমা তথা 'আল্লাহু আকবার' বলে ছালাত শুরু করা আবশ্যক। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'কারো ছালাত ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না সে ঠিক মত ওযূ করবে। অতঃপর اَللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলবে' *(ত্বাবারাণী, সনদ ছহীহ, মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ৬৬)*। নবী

করীম (ছাঃ) আরো বলেন, 'ছালাতের শুরু হ'ল 'তাকবীর' এবং শেষ হ'ল 'সালাম' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৩১২ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। ইমাম তিরমিযী বলেন, 'এটাই হ'ল এ বিষয়ে বর্ণিত বিশুদ্ধতম হাদীছ' *(আলবানী, মিশকাত ১/১০২ টীকা-৪)*।

প্রশ্নঃ (৯/৩৬৯)ঃ শিয়ালের থাবায় মুরগীর গলা যবেহ হয়ে গেলে পুনরায় যবেহ না করে খাওয়া জায়েয হবে কি? জবাব দানে বাধিত করবেন।

-এফ,এম লিটন
কাঠিগ্রাম, ফকির বাড়ী
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ হিংস্র জন্তুর আঘাতে যদি কোন হালাল প্রাণী মারা যায় তাহ'লে খাওয়া হারাম। তবে তাকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেলে যবেহ করে খাওয়া হালাল হবে *(মায়েদাহ ৩)*।

প্রশ্নঃ (১০/৩৭০)ঃ আমরা জানি পশু-পাখী বা মানুষের ছবি আঁকলে গোনাহ হয়। কিন্তু আমি যদি পূর্ণাঙ্গ মানুষের ছবি না এঁকে শরীরের অংশবিশেষের ছবি আঁকি তাহ'লেও কি গোনাহ হবে? অথবা এমন ছবি আঁকি যে আকৃতির মানুষ হ'তে পারে না। যেমন কার্টুন ছবি ইত্যাদি। জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আয়েশা বানু
উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ প্রাণীর পূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট ছবি হারাম। কিন্তু যদি মাথা কেটে ফেলা হয় এবং অঙ্গাদি পৃথক করে ফেলা হয় তবে তাতে অনুমতি আছে। কারণ ছবির মূল হ'ল মাথা। যদি মাথা ছেদ করে দেওয়া হয় তাহ'লে আর রূহ থাকল না। তখন তা জড় পদার্থের পর্যায়ে পড়ে। সুতরাং মাথা ব্যতীত শরীরের অন্যান্য অঙ্গের ছবি আঁকা যাবে। এ সম্বন্ধে জিবরীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলেন; 'আপনি মূর্তির মাথা কেটে দিতে বলুন, ফলে উহা গাছের মত একটা কিছুতে পরিবর্তিত হবে... *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫০১ 'পোষাক-পরিচ্ছদ' অধ্যায়, 'ছবি' অনুচ্ছেদ; বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০০২ দরসে হাদীছ 'ছবি ও মূর্তি')*। অনুরূপভাবে মানুষ অথবা আল্লাহ্‌র যেকোন সৃষ্টির ব্যঙ্গাত্মক ছবি বা কার্টুন আঁকাও সিদ্ধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি' *(ত্বীন ৪)*। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই' *(রূম ৩০)*।

প্রশ্নঃ (১১/৩৭১)ঃ 'তাহিইয়াতুল ওযূ' ও 'তাহিইয়াতুল মসজিদ'-এর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

-আফযাল হোসাইন
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'তাহিইয়াতুল ওযূ' ও 'তাহিইয়াতুল মসজিদ'-এর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। তাহিইয়াতুল ওযূর সম্পর্ক হচ্ছে ওযূ করার পর ছালাত আদায়ের সাথে। আর তাহিইয়াতুল মসজিদের সম্পর্ক হচ্ছে মসজিদে প্রবেশের সময় ছালাত আদায়ের সাথে। এক্ষণে ওযূ করার পর মসজিদে প্রবেশ করলে কেবল তাহিইয়াতুল মসজিদ পড়তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আমার ওযূর ন্যায় ওযূ করল অতঃপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করল, যে দু'রাক'আতে দুনিয়াবী কোন চিন্তা-ভাবনা করল না, তার অতীতের সমস্ত (ছগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৮৭ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*।

তাহিইয়াতুল মসজিদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখনই তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০৪ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। আর যদি জুম'আর খুৎবার সময় প্রবেশ করে, তাহ'লে ঐ দু'রাক'আত সংক্ষেপে পড়বে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১১)*। বুরাইদাহ বলেন, একদিন ফজরের পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেলালকে ডেকে বললেন, কোন্ কাজ তোমাকে আমার আগে আগে জান্নাতে নিয়ে যাচ্ছে? কেননা যখনই আমি জান্নাতে প্রবেশ করি, তখনই আমার আগে আগে তোমার গমনের আওয়ায শুনি। জবাবে বেলাল বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি আযান দিলেই তার পরে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করি এবং যখনই ওযূ নষ্ট হয় তখনই ওযূ করি এবং মনে করি যেন আমার উপরে দু'রাক'আত ছালাত আল্লাহ্‌র জন্য আবশ্যিক হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, এজন্যই হ'তে পারে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩২৬; কাছাকাছি একই মর্মের হাদীছ মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩২২ 'নফল ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, দু'টি নফল ছালাত দু'কাজের জন্য।

প্রশ্নঃ (১২/৩৭২)ঃ অসাবধানতাবশতঃ নির্ধারিত সময়ের এক দেড় মিনিট পূর্বে ইফতার করলে সে ছিয়াম হবে কি? নাকি পুনরায় আদায় করতে হবে? জবাবদানে বাধিত করবেন।

-শারাফাত
পাথরঘাটা, ঝাউডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে ছিয়াম হয়ে যাবে। এজন্য ক্বাযা করতে হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের উপর থেকে ভুল-ভ্রান্তির গোনাহ ও বাধ্যগত কাজের গোনাহ বিদূরিত করা হয়েছে' *(বায়হাক্বী, ছহীহুল জামে' হা/৭১১০)*। উল্লেখ্য যে, সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৮৫)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৭৩)ঃ লোকালয় থেকে দূরে একটি কবরে প্রতি বছর কুকুর বাচ্চা প্রসব করে। একদিন মৃত ব্যক্তির এক আত্মীয় ফজর ছালাতের পর কবর যিয়ারত করতে গিয়ে দেখে উক্ত কবরের উপরে একটি বিরাট আকৃতির সাপ। তার সমস্ত শরীরে বড় বড় চোখ রয়েছে এবং সাপটি যিয়ারতকারীর দিকে তাকাচ্ছে। এমতাবস্থায় ঐ

ব্যক্তি বাড়ীতে এসে লোকজন নিয়ে কবরস্থানে যায়। কিন্তু সাপটি আর দেখতে না পেলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এক্ষণে কি করণীয় জানিয়ে বাধিত করবেন

-মুহাম্মাদ জুয়েল চৌধুরী
ঈদগাহ আবাসিক এলাকা
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ যদিও উক্ত ঘটনাটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে খারাপ মনে হয়, তবুও এটি তার শাস্তির কারণে হচ্ছে এ কথা বলা যাবে না। কেননা কবরের শান্তি বা শাস্তি কোনটাই মানুষকে বাহ্যিকভাবে দেখানো বা জানানো হবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/১২৯ 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ)*। সব ধরনের মৃত মুমিন ব্যক্তির জন্য দো'আ ও দান-ছাদাক্বা করার বিধান হাদীছে রয়েছে। অতএব এ অবস্থায় আপনার করণীয় হ'ল, উক্ত কবরস্থানকে পরিচ্ছন্ন রাখা এবং মৃতের জন্য খালেছ অন্তরে দো'আ করা ও দান-ছাদাক্বা করা। তবে এ জন্য কোনরূপ অনুষ্ঠান করা যাবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা মারা গেছেন এবং ধন-সম্পদ রেখে গেছেন। কিন্তু তিনি কোন অছিয়ত করে যাননি। আমি ছাদাক্বা করলে তার গোনাহ মাফ হবে কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ' *(আহমাদ, মুসলিম, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০৮ পৃঃ 'শোক প্রকাশ ও কবর যিয়ারত' অধ্যায়, 'যে সমস্ত আমল দ্বারা মৃত ব্যক্তির উপকার হয়' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৭৪)ঃ বিয়ে রেজিষ্ট্রি করা কি ঠিক? বরের পক্ষ থেকে মেয়ের জন্য যা কিছু দেওয়া হয়, সেগুলি কি মোহরানার মধ্যে গণ্য হবে?

-আব্দুর রহমান
গ্রাম ও পোঃ বারকোনা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ বিবাহ রেজিষ্ট্রি করা শরী'আত পরিপন্থী নয়। বরং এর দ্বারা বিবাহ বন্ধন আরো পাকাপোক্ত এবং সরকারী দফতরভুক্ত হয়। সমাজের অনিবার্য দাবীতে এ পদ্ধতি চালু হয়েছে। যেমনটি জামি রেজিষ্ট্রির ক্ষেত্রে হয়েছে। তবে কেউ রেজিষ্ট্রি বিহীন বিবাহ সম্পাদন করলে সেটিও নিঃসন্দেহে বৈধ হবে। বিবাহের সময় বর তার কনের জন্য যা কিছু নিয়ে আসে, সবই মোহরানার মধ্যে গণ্য করা যাবে। তাছাড়া মোহরানার বিষয়টি সম্পূর্ণ বরের সামর্থ্য ও উভয়ের সন্তুষ্টিতে নির্ধারিত হ'তে হবে। সেটি একটি লোহার আংটি, এক পেয়ালা খেজুর বা কুরআন শিক্ষা দানও হ'তে পারে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২০২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২১৮ পৃঃ; 'মোহর' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৩৭৫)ঃ নফল ছালাত আদায় করছে এমন ব্যক্তিকে ইমাম গণ্য করে তার পিছনে ফরয ছালাত আদায় করা যায় কি?

-মুবায়দুর রহমান
মহিষপুর, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ নফল ছালাত আদায়কারীর পিছনে ফরয ছালাত আদায় করা যায়। জাবির (রাঃ) বলেন, মু'আয (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে এশার ফরয ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর নিজ গোত্রে এসে তাদের এশার ছালাত আদায় করাতেন। পরের ছালাত তার জন্য নফল হ'ত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৫১)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৩৭৬)ঃ ইমাম যদি মুসাফির হন এবং মুক্তাদী মুক্বীম হয় অথবা এর বিপরীত হয়, তাহ'লে কিভাবে ছালাত আদায় করতে হবে?

-হাবীবুর রহমান
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ ইমাম মুসাফির হ'লে এবং ছালাত দু'রাক'আত পড়লে, মুক্তাদীদেরকে বাকী দু'রাক'আত পূর্ণ করতে হবে। আর যদি ইমাম মুক্বীম হন এবং মুক্তাদী মুসাফির হয়, তাহ'লে মুসাফিরকে ইমামের সাথে পূর্ণ ছালাত আদায় করতে হবে। ইবনু ওমর (রাঃ) মুসাফির অবস্থায় মুক্বীম ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করলে চার রাক'আত আদায় করতেন। আর যখন একা ছালাত আদায় করতেন, তখন দু'রাক'আত ক্বছর করতেন *(মুসলিম ১/২৪৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৩৭৭)ঃ ছালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে একামতের পর তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে কথা বলা যায় কি?

-আবুল হাসান
পলিকাদোয়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় প্রয়োজনীয় কথা বলা যায়। এমনকি বিশেষ প্রয়োজনে মসজিদের বাইরেও যাওয়া যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা ছালাতের একামত দেওয়া হ'ল এবং দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করা হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আসলেন এবং তাঁর ছালাতের স্থানে দাঁড়ালেন। তারপর তাঁর স্মরণ হ'ল যে, তিনি অপবিত্র অবস্থায় আছেন। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা নিজ নিজ স্থানে অপেক্ষা কর। অতঃপর তিনি বাড়ী ফিরে গেলেন ও গোসল করলেন। তারপর আমাদের নিকটে আসলেন। এমতাবস্থায় তাঁর মাথা হ'তে টপ টপ করে পানি পড়ছিল। তিনি 'আল্লাহ আকবার' বললেন এবং আমাদের ছালাত আদায় করালেন' *(বুখারী ১/৪১ পৃঃ.....)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৭৮)ঃ কিছু সাধারণ ব্যবসায়ী প্রায় প্রতিদিন বাজারে কাঁচামাল ক্রয়-বিক্রয় বাবদ আমার নিকটে থেকে ৫০০/১০০০ টাকা নেয়। অতঃপর শতকরা ৫/৬ টাকা অথবা মণ প্রতি ৫/৬ টাকা লাভসহ মোট টাকা আমাকে ফেরত দেয়। এ ধরনের ব্যবসা বৈধ হবে কি?

-আনীসুর রহমান
সাং- জোয়ার, নওগাঁ।

উত্তরঃ এরূপ ব্যবসা জায়েয নয়। তবে আপনি উক্ত ব্যবসায়ের লভ্যাংশের একটা ভাগ নিবেন দু'জনের সম্মতির ভিত্তিতে। তাহ'লেই ব্যবসাটি জায়েয হবে। এখানে টাকা

আপনার এবং ব্যবসা অন্যের। একে 'মুযারাবাহ' বলা হয়। এ ধরনের ব্যবসা জাহেলী যুগেও ছিল, যা ইসলাম জায়েয রেখেছে। আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াকূব তার পিতার মধ্যস্থতায় তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, 'তার দাদা ওছমান (রাঃ)-এর অর্থ নিয়ে ব্যবসা করতেন এবং লাভ তাদের উভয়ের মাঝে ভাগ হ'ত' *(বুলূগুল মারাম হা/৮৯৫ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'মুযারাবা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৩৭৯)ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য হজ্জ করা যায় কি?

-নাজীবুর রহমান
ফার্মেসী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির জন্য হজ্জ করা যায়। বুরায়দা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বসেছিলাম। ইতিমধ্যে একজন মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার মা মারা গেছেন। তাঁর উপর এক মাসের ছিয়াম রয়েছে, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে ছিয়াম পালন করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি তার পক্ষ থেকে ছিয়াম পালন কর। মহিলা বলল, তিনি কখনো হজ্জ করেননি, আমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হাঁ, কর' *(মুসলিম ১/৩৬২পৃঃ; মিশকাত হা/১৯৫৫ 'যাকাত' অধ্যায়)*। উল্লেখ্য যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষে হজ্জ করার পূর্বে নিজের হজ্জ করতে হবে *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৫২৯ 'হজ্জ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩৮০)ঃ দু'বছর পর সন্তানকে দুধ পান করানো যায় কি?

-আব্দুল্লাহ
দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ দু'বছর পর সন্তানকে দুধ পান করানোতে কোন দোষ নেই। কারণ পূর্ণ দু'বছর বাচ্চাকে দুধ পান করানোর কথা আল্লাহ তা'আলা ঐ অবস্থায় বলেছেন, যখন স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং স্ত্রীর কোলে দুগ্ধপোষ্য বাচ্চা থাকবে *(বাক্বারাহ ২৩৩)*। দু'বছরই দুধ পান করাতে হবে, কমবেশী করা যাবে না এটা উদ্দেশ্য নয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'একদা নবী করীম (ছাঃ) তাঁর নিকট গেলেন, তখন তাঁর নিকট ছিল একজন পুরুষ। এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপসন্দ করলে আয়েশা (রাঃ) বললেন, ইনি আমার দুধ ভাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, দেখ তোমাদের ভাই কারা? দুধের মাধ্যমে ক্ষুধা নিবারণ করার সময়কাল পর্যন্ত দুধ খাওয়ালে দুধ ভাই সাব্যস্ত হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০৩১ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুধ যতদিন পর্যন্ত বাচ্চার ক্ষুধা নিবারণের মাধ্যম হবে, ততদিন পান করাতে পারে। উল্লেখ্য যে, দুধমাতা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য বাচ্চার দু'বছর বয়সের মধ্যেই দুধ পান করতে হবে। যদিও উক্ত সময়ের পরেও মায়ের দুধ পানে কোন বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (২১/৩৮১)ঃ যাকাত এবং ওশর বন্টনের যে আটটি খাত রয়েছে সেগুলি কি কি? আমাদের দেশে কারা পাওয়ার হক্বদার? যেসব খাত এ দেশে নেই সেগুলি কি করতে হবে?

-মসজিদ কমিটি
মুশরিভুজা, ভোলাহাট
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কুরআন মাজীদে 'ছাদাক্বা' বন্টনের যে আকটি খাত রয়েছে তা নিম্নরূপঃ (১) ফক্বীর (২) মিসকীন (৩) যাকাত আদায়কারী (৪) ঐসব লোক যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য থাকে (৫) দাস মুক্তির জন্য (৬) ঋণগ্রস্তদের জন্য (৭) মুসাফিরদের জন্য (৮) আল্লাহ্র পথে ব্যয়। 'আল্লাহ্র পথ' বলতে সেই সমস্ত চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রামের মাধ্যমকে বুঝায়, যদ্বারা কুফরকে দমন এবং আল্লাহ্র বাণীকে সমুন্নত করা যায়। জিহাদের খাত সহ ছহীহ আক্বীদার প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলি এর অন্তর্ভুক্ত। ওশর এবং যাকাত আট ভাগ করতেই হবে এটা উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য নয়; বরং আট শ্রেণীর লোক পাবে এটাই বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কাজেই কমবেশী করা যাবে। কোন খাত বাদও দেওয়া যাবে।

উল্লেখ্য যে, 'মুওয়াল্লাফাতুল কুলূব' বলতে অমুসলিমদের হৃদয় সমূহকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা বুঝায়, নও মুসলিম নয়। খ্রীষ্টানরা টাকা দিয়ে হাযার হাযার অখ্রীষ্টানকে খ্রীষ্টান করে ফেলছে। অথচ মুসলমানেরা যাকাতের উক্ত খাতটি যথাযথভাবে ব্যয় করলে খ্রীষ্টান মিশনারীদের মোক্ষম জবাব হয়ে যেত।

প্রশ্নঃ (২২/৩৮২)ঃ ছালাতের মধ্যে শয়তানের কুমন্ত্রণা হ'তে বাঁচার জন্য ডান দিকে থুথু ফেলতে হবে, না বাম দিকে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুস্তাফীযুর রহমান
শামসুন বইঘর, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ছালাতের মধ্যে শয়তানের কুমন্ত্রণা অনুভব করলে বাম দিকে তিন বার থুক মারতে হবে। ওছমান ইবনু আবিল 'আছ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! নিশ্চয়ই শয়তান আমার মাঝে ও আমার ছালাতের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং আমার ক্বিরাআত উলটপালট করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এটা হচ্ছে শয়তান, তার নাম 'খিনযাব'। তুমি এরূপ অনুভব করলে আল্লাহ্র নিকট শয়তান হ'তে পরিত্রাণ চাও 'আ'ঊযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম' বলবে এবং তোমার বাম দিকে তিন বার থুক মারবে। রাবী বলেন, আমি এরূপ করলে আল্লাহ আমার থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করে দেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কুমন্ত্রণা' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য, এখানে 'থুক' অর্থ থুথু বিহীন 'থুক'।

প্রশ্নঃ (২৩/৩৮৩)ঃ কবর স্থানের বাঁশ বাড়ির কাজে লাগানো যায় কি?

-আব্দুল হামীদ
কমরপুর,গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ কবর স্থান ওয়াক্ফ করা হ'লে কবর স্থানের বাঁশ নিজ কাজে লাগানো যাবে না। কারণ ওয়াক্ফ করা সম্পদ ফেরত নেওয়া যায় না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দান করে ফেরত নেওয়া কাজটি সেই কুকুরের মত, যে বমন করে পুনরায় তা ভক্ষণ করে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩০১৮)*। তবে পিতা ছেলেকে দান করার পর ফেরত নিতে পারে *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৩০২০)*। কবর স্থান ওয়াক্ফ না হ'লে বা নিজ জমিতে হ'লে, বাঁশ নিজের কাজে লাগানো যায়।

প্রশ্নঃ (২৪/৩৮৪)ঃ হাই উঠার সময় কোন্ দো'আ পড়তে হয় জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হাই
চাঁদপুর, পাবনা।

উত্তরঃ হাই উঠার সময় কোন দো'আ পড়তে হবে না। তবে হাত দ্বারা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কারো হাই আসে তখন সে যেন তা যথাসম্ভব প্রতিরোধ করে। কারণ যখন কেউ হাই তোলে তখন শয়তান (উপহাস করে) হাসে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৩২)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কারো হাই আসে তখন সে যেন স্বীয় হাত দ্বারা নিজের মুখ বন্ধ করে রাখে। কেননা শয়তান মুখের ভিতর প্রবেশ করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৩৭ 'আদাব' অধ্যায়)*। উল্লেখ্য যে, ঐ সময় 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলার কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (২৫/৩৮৫)ঃ সূরা ইখলাছ তিনবার পড়লে একবার কুরআন খতমের সমান নেকী পাওয়া যাবে। একথা কি ঠিক?

-ইদরীস
বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কথাটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ কোন রাতে কুরআনের তিনভাগের একভাগ পড়তে অপারগ কি? তারা বলল, কিভাবে পড়া যাবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'সূরা ইখলাছ হচ্ছে কুরআনের তিন ভাগের একভাগ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৭)*। এর দ্বারা মূলতঃ সূরা ইখলাছের উচ্চ মর্যাদা বুঝানো হয়েছে। তিনবার সূরা ইখলাছ পড়া দ্বারা পূর্ণ কুরআন পাঠ করা বুঝানো হয়নি।

প্রশ্নঃ (২৬/৩৮৬)ঃ মহিলারা জানাযা ও দাফনের কাজে শরীক হ'তে পারে কি?

-রফীকুল ইসলাম
মহিষখোচা, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ মহিলারা জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে সেটা যরূরী নয়। উম্মু আত্বীয়া (রাঃ) বলেন, 'আমাদেরকে জানাযায় যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে দৃঢ়ভাবে নিষেধ করা হয়নি' *(বুখারী ১/১৭০, মুসলিম ১/৩২৪ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, মহিলাদের দাফন কাজে শরীক হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (২৭/৩৮৭)ঃ ইসলামী জালসা উপলক্ষে যে চাঁদা আদায় করা হয়, জালসা শেষে সে চাঁদা কিছু অবশিষ্ট থাকলে মসজিদের কাজে লাগানো যাবে কি?

-শমশের আলী
মুজগুন্নী, কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ ইসলামী জালসা উপলক্ষে যে চাঁদা দেওয়া হয়, যদি তা নিজ হালাল মাল থেকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, তাহ'লে তার অবশিষ্ট চাঁদা মসজিদে লাগানো যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই মসজিদের কাজে সমূহ একমাত্র আল্লাহ্র জন্য' *(জিন ১৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র বস্তু ব্যতীত কবুল করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৮৮)ঃ কেউ যদি শহীদ হওয়ার কামনা করে শহীদ না হয়ে মৃত্যুবরণ করে, সেকি শহীদের মর্যাদা পাবে?

-মাস'উদ রানা
মোলামগাড়ী হাট
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি খালেছ অন্তরে শহীদ হওয়ার আকাংখা করে থাকলে, অবশ্যই তিনি শহীদের মর্যাদা পাবেন। সাহল বিন হুনাইফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকটে খালেছ অন্তরে শাহাদত কামনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদগণের স্তরে পৌঁছে দেন, যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৮ 'জিহাদ' অধ্যায়; বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ ডিসেম্বর ২০০১ দরসে কুরআন, 'জিহাদ ও ক্বিতাল')*।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৮৯)ঃ ছালাতুল জানাযায় সকলের উপস্থিত হওয়া কি যরূরী। রাসূল (ছাঃ)-কে কারা গোসল দিয়েছিলেন?

-আব্দুর রউফ
কলারোয়া বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ একজন মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জানাযায় উপস্থিত হওয়া 'ফরযে কিফায়াহ'। অর্থাৎ সকলের পক্ষে কিছু লোক উপস্থিত থাকাই যথেষ্ট। ছাহাবীগণ একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছাড়াই জনৈক ব্যক্তির জানাযা ও দাফন সম্পন্ন করেন' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১২৪৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটাত্মীয়রাই তাঁকে গোসল দিয়েছিলেন। যেমন আলী ইবনু আবি ত্বালিব, আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব, ফযল ইবনু আব্বাস, কুসাম বিন আব্বাস, উসামা বিন যায়েদ ও শুক্বরান (রাঃ) প্রথম জন আপন

চাচাতো ভাই ও জামাতা, দ্বিতীয় জন আপন চাচা, তৃতীয় ও চতুর্থ জন আপন চাচাতো ভাই, শেষোক্ত দু'জন রাসূলের গোলাম, যারা কেবল পানি ঢালার কাজে সাহায্য করেছিল। রাসূলের গায়ের জামা না খুলে আলী নিজে তাঁকে গোসল দিয়েছিলেন বাকী তিনজন তাঁকে সাহায্য করেছিলেন *(ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাভিয়াহ (মিশরী ছাপা ১৩৭৫/১৯৫৫) ২/৬৬২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩৯০)ঃ আমরা স্বামী-স্ত্রী আইয়ামে বীয-এর ছিয়াম পালন করি। কিন্তু বিকেলে তরকারী রান্না করার সময় লবণ হয়েছে কি-না চেখে দেখি। এতে কি ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে?

-আব্দুশ শুকুর ও আমীনা
পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় কোন কিছুর স্বাদ চেখে দেখলে ছিয়াম নষ্ট হবে না। তবে স্বাদ চাখার সময় যাতে কণ্ঠনালীতে প্রবেশ না করে, সেদিকে খেয়াল রাখা যরূরী। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ঝোল বা কোন বস্তুর স্বাদ চাখার সময় হলক্ব বা কণ্ঠনালীতে প্রবেশ না করলে কোন ক্ষতি নেই' *(ইরওয়াউল গালীল ৪/৮৬ পৃঃ)*। অন্য বর্ণনায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ঝোল বা কোন বস্তুর স্বাদ চেখে দেখলে ছিয়াম নষ্ট হয়ে না' *(আহমাদ, বুখারী, ইরওয়া হা/৯৩৭ পৃঃ; দ্রষ্টব্যঃ নভেম্বর ২০০১ প্রশ্নোত্তর ৯/৪৪)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩৯১)ঃ রক্ত প্রবাহিত হ'লে পুনরায় ওযূ করতে হবে কি? সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ফেরদৌসী
গড়মাটি, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তরঃ উল্লিখিত মর্মের হাদীছটি যঈফ। ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তামীম আদ-দারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'রক্ত প্রবাহিত হ'লে ওযূ করতে হবে' *(দারাকুৎনী, মিশকাত 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। হাদীছটি যঈফ। হাদীছটিতে ইয়াযীদ ইবনু খালিদ, ইয়াযীদ ইবনু মুহাম্মাদ এবং বাক্বীয়াহ বিন ওয়ালীদ রাবীগণ যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ ১/৬৮১ পৃঃ হা/৪৭০)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, কম হৌক বেশী হৌক ইস্তেহাযার রক্ত ব্যতীত অন্য কোন রক্ত প্রবাহিত হওয়ার কারণে ওযূ ওয়াজিব হওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই' *(তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/১০৮ পৃঃ, হা/৩৩৩-এর টীকা-২ 'যে বস্তু ওযূ ওয়াজিব করে' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩৯২)ঃ মাসিক ভাল না হওয়া পর্যন্ত আমার স্বামী আমাকে পৃথক বিছানায় শুইতে দেন। এটা কি ঠিক?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
চকবোচাই, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ মাসিক অবস্থায় স্ত্রীকে পৃথক করা ইহুদীদের কাজ। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, ইহুদীদের কোন স্ত্রীলোকের মাসিক হ'লে স্বামীরা তাদের সাথে একত্রে খাওয়া-দাওয়া করত না, একত্রে থাকত না। এ বিষয়ে ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তা'আলা সূরা বাক্বারাহ্র ২২২ নং আয়াত নাযিল করেন। যেখানে মাসিক অবস্থায় শুধু সহবাস নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস ব্যতীত সবকিছু করতে পার' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৫, 'ঋতু' অনুচ্ছেদ)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার মাসিক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার কোলে মাথা রেখে কুরআন তেলাওয়াত করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮)*। তবে মাসিক অবস্থায় মিলনের আশংকা থাকলে পৃথক থাকা ভাল। *(দ্রঃ আত-তাহরীক মার্চ ২০০১ প্রশ্নোত্তর ১৬/১৯১)*। উল্লেখ্য যে, 'মা আয়েশা (রাঃ) ঋতুকালীন সময়ে খাট থেকে নীচে নেমে চাটাইতে শুতেন' মর্মে আবুদাঊদে যে হাদীছটি এসেছে, সেটি 'মুনকার' বা যঈফ *(মিশকাত হা/৫৫৬ 'পবিত্রতা' অধ্যায় 'ঋতু' অনুচ্ছেদ)*। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিপরীতে 'যঈফ' হাদীছের উপরে আমল করা যাবে না।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৯৩)ঃ যারা ছালাত আদায় করে না, ছাহাবীগণ নাকি তাদেরকে কাফের বলে গণ্য করতেন, একথা কি ঠিক?

-মুছত্বফা কামাল
চোপীনগর, কামারপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ উল্লিখিত বক্তব্যটি সঠিক। আব্দুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব (তাবেঈ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরী বলে মনে করতেন না ছালাত ব্যতীত। অর্থাৎ ছাহাবীগণ ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যতীত কাউকে কাফের গণ্য করতেন না *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৭৯ ছালাত' অধ্যায় সনদ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ২য় খণ্ড হা/৫৩২)*। তবে এই কাফিররা 'কালেমায়ে শাহাদাত'-কে অস্বীকারকারী কাফিরদের ন্যায় চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। বরং কালেমার বরকতে ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শাফা'আতের ফলে শেষ পর্যায়ে তারা এক সময়ে জান্নাতে ফিরে আসবে *(আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৮-২০)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৯৪)ঃ বিবাহের দিন মেয়ের বাবার বাড়ীতে যে অনুষ্ঠান করা হয় তাকে 'ওয়ালীমা' বলা কি শরী'আত সম্মত?

-পলাশ
জয়নগর, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিয়ের দিন মেয়ের পিতার বাড়ীতে যে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় সেটি 'ওয়ালীমা' নয়। ওয়ালীমা হ'ল বরের বাড়ীতে বিয়ের পরের দিন যে অনুষ্ঠান করা হয়। মূলতঃ আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায়ের জন্য এবং দাম্পত্য জীবনের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য ওয়ালীমার ব্যবস্থা করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যয়নবের সাথে মিলামিশা করার

পর 'ওয়ালীমা' অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং লোকদেরকে গোশত রুটি তৃপ্তি সহকারে খাইয়েছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৩২১২ 'বিবাহ' অধ্যায় 'ওয়ালীমা' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য, কোন কোন এলাকায় এ প্রথা চালু আছে যে, বিবাহ অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে সবাইকে ওয়ালীমার দাওয়াত দেওয়া হয়। অতঃপর কিছু বাতাসা বা মুড়ি-জিলাপী খাইয়ে দিয়ে ওয়ালীমার কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করা হয়। এ প্রথাটি সম্পূর্ণরূপে সুন্নাত বিরোধী। এগুলি অবিলম্বে বন্ধ করা কর্তব্য।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৯৫)ঃ আল্লাহ তা'আলা মুত্তাক্বীদেরকে যে জান্নাত দিবেন তার স্বরূপ কেমন হবে? অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে কি কি থাকবে।

-যাকারিয়া
কমরগ্রাম, বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ জান্নাতের সুখ-শান্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'মুত্তাক্বীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর, যার স্বাদ অবর্ণনীয়; আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর; আছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফলমূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা' *(মুহাম্মাদ ১৫)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, সেখানে থাকবে আনতনয়না রমণীগণ, যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি, তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ' *(আর-রহমান, ৪৬, ৪৮, ৫০, ৫২, ৫৪, ৫৬ ও ৫৮)*। এছাড়া অসংখ্য আয়াতে মুত্তাক্বীদের জান্নাতের নে'মত সমূহ বর্ণিত হয়েছে *(ওয়াক্বি'আহ ২৮-৩২; দাহর ১৯; দ্রঃ দরসে কুরআন, 'জান্নাতের বিবরণ' সেপ্টেম্বর ২০০০)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৯৬)ঃ শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ (রহঃ)-এর নিকট 'রাফ'উল ইয়াদায়েন অধিক প্রিয়' ছিল, আসলেই কি তিনি এ কথা বলেছেন? দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুছ ছামাদ
গ্রাম ও পোঃ মোগলাহাট
লালমণিরহাট।

উত্তরঃ উল্লিখিত মর্মের বক্তব্যটি শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)-এর নিজস্ব উক্তি। তিনি বলেন, وَالَّذِيْ يَرْفَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ لاَيَرْفَعُ فَإِنَّ أَحَادِيْثَ الرَّفْعِ أَكْثَرُ وَأَثْبَتُ– 'যে মুছল্লী রাফ'উল ইয়াদায়েন করে সে মুছল্লী আমার নিকটে অধিক প্রিয় ঐ মুছল্লীর চেয়ে, যে রাফ'উল ইয়াদায়েন করে না। কেননা রাফ'উল ইয়াদায়েন-এর হাদীছ সংখ্যায় অধিক ও অধিকতর মযবুত' *(হুজ্জাতুল্লা-হিল বালিগাহ ২/১০ পৃঃ; আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৬৫-৬৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৯৭)ঃ বাবা-মা আমাকে উপুড় হয়ে শয়ন করতে নিষেধ করেন। এটি কি শরী'আতে নিষিদ্ধ, না প্রচলিত প্রথা?

-ছাদেকুল ইসলাম
রাজবাড়ী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তরঃ উপুড় হয়ে শয়ন করা নিষিদ্ধ। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে শোয়া দেখে বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা এ পদ্ধতিতে শোয়া পসন্দ করেন না' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৭১৮-১৯; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩০১৫, 'উপুড় হয়ে শয়ন করা নিষিদ্ধ' অধ্যায় নং ২৭)*। অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, একদা আমি উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, হে জুনদুব (আবু যার-এর নাম) শোয়ার এ পদ্ধতি জাহান্নাম বাসীদের পদ্ধতি' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩৩১৬; মিশকাত হা/৪৭৩১ 'আদাব' অধ্যায়; দ্রঃ আত-তাহরীক এপ্রিল-মে ২০০২, প্রশ্নোত্তর ৩৭/২৪৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৯৮)ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর নিম্নের উক্তি কি সঠিক? যদি সঠিক হয় তাহ'লে কোন কিতাবে আছে। মূল আরবীটুকু লিখে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। অংশটুকু হ'ল-

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একদিন স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি তাঁর সামনে পাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে মাছি তাড়াবার জন্য বাতাস করছি'। তারপর স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীদের নিকটে এ স্বপ্নের তা'বীর জিজ্ঞেস করলে তাঁরা উত্তরে বলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি আরোপিত মিথ্যা হাদীছ প্রতিরোধ করবেন। বস্তুতঃ এ স্বপ্ন ও ব্যাখ্যাই আমাকে ছহীহ বুখারী সংকলনের জন্য সাহায্য করেছে'।

-আবুল হাসান
মুড়াগাছা, খোকসা, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর ছহীহ বুখারী সংকলনের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লিখিত বক্তব্য পেশ করেছেন *(ইবনু হাজার আসক্বালানী, মুক্বাদ্দামা ফাৎহুল বারী (কায়রোঃ ১৪০৭/১৯৮৭) ৯ পৃঃ; ছহীহ বুখারী (দিল্লী ছাপা) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪)*। মূল আরবী হ'ল,

قَالَ الإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّنِي وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَبِيَدِيْ مِرْوَحَةٌ أَذُبُّ بِهَا عَنْهُ فَسَأَلْتُ بَعْضَ الْمُعَبِّرِيْنَ فَقَالَ لِيْ أَنْتَ تَذُبُّ عَنْهُ الْكِذْبَ، فَهُوَ الَّذِيْ حَمَلَنِيْ عَلَى إِخْرَاجِ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ–

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৯৯)ঃ স্বামী স্ত্রীকে এ ধরনের নছীহত করতে পারে কি যে, আমি মারা গেলে তুমি অন্যত্র বিবাহ করো

না?

-রোজিনা ও সুলতানা
গ্রাম ও পোঃ বোরাকনগর
রূপসা, খুলনা।

উত্তরঃ স্বামী তার স্ত্রীকে উল্লিখিতভাবে নছীহত করতে পারে। হুযায়ফা (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে বলেন, 'যদি তুমি আমার সাথে স্ত্রী হিসাবে জান্নাতে থাকতে চাও, তাহ'লে আমার পরে অন্যত্র বিবাহ করোনা' কেননা জান্নাতে স্ত্রীগণ তাদের সর্বশেষ স্বামীর সাথে থাকবে (যদি সে নেককার হয়)। আর একারণেই রাসূলের স্ত্রীগণের জন্য অন্যত্র বিবাহ আল্লাহ হারাম করেছেন। কেননা তাঁরা জান্নাতে তাঁর স্ত্রী হবেন' *(বায়হাক্বী ৭/৬৯-৭০; আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২৮১)*। তবে উক্ত রূপ অছিয়ত মানার জন্য ইসলামী শরী'আত স্ত্রীকে বাধ্য করে না। ইচ্ছা করলে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করতে পারে *(বাক্বারাহ ২৩৪-২৩৫)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪০০)ঃ আমাদের এলাকায় কোন কোন ইমাম রুকুর পূর্বে বেশ কিছুক্ষণ সাকতা করেন এবং সে সময় মুক্তাদীগণকে সূরায়ে ফাতিহা পড়তে বলেন। কোন ইমাম এটা না করলে তার পিছনে ছালাত জায়েয হবে না, এমনকি জুম'আর ছালাতে এটা না করলে তাকে পুনরায় যোহর পড়তে হবে বলে ফৎওয়া দেন। এক্ষণে এভাবে সাকতা করে সূরা ফাতিহা পাঠ করা শরী'আত সম্মত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-তরীকুযযামান
হাড়াভাঙ্গা মাদরাসা, মেহেরপুর
ও
আহসানুল হক
প্রভাষক, পৌর কলেজ, মেহেরপুর।

উত্তরঃ 'সাক্তা' অর্থ সামান্য বিরতি দেওয়া। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন, 'আয়াত পাঠ শেষে নিঃশ্বাস ছাড়ার বাড়তি সময়টুকুকে 'সাক্তা' বলে الزيادة على حد التنفس في أواخر الأيات *(মিরক্বাত (দিল্লী ছাপা, তারিখ বিহীন) ২/২৮০)*। জেহরী ছালাতে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী যে সাকতার কথা এসেছে, তা হ'ল, তাকবীরে তাহরীমার পরে। এর পরিমাণ হ'ল 'আল্লাহুম্মা বা'এদ বায়নী' ... তথা 'দো'আয়ে ইস্তেফতাহ' পড়া শেষ করা পর্যন্ত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮১২ 'ছালাত' অধ্যায়, 'তাকবীরে তাহরীমার পরে কি পড়তে হবে' অনুচ্ছেদ-১১ পৃঃ)*। এক্ষণে সূরা ফাতিহা শেষে এবং সকল ক্বিরাআত শেষে রুকুর পূর্বে মোট দু'টি স্থানে যে সাকতার কথা এসেছে, তার রাবী হ'লেন তাবেঈ বিদ্বান হাসান বছরী। যিনি বর্ণনা করেছেন সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) হ'তে *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৮১৮)*। তিরমিযী হাদীছটিকে 'হাসান' বলেছেন। কিন্তু সনদে ও মতনে বিভিন্ন ত্রুটি থাকায় শায়খ আলবানী এটিকে 'যঈফ' বলেছেন *(দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/৫০৫; যঈফ আবুদাঊদ হা/৭৭৭-৭৮০)*। ছাহাবী হযরত সামুরা থেকে হাসানের শ্রবণ বিষয়টি নিশ্চিত কি-না সে বিষয়ে মতভেদ থাকায় ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে 'ছহীহ' না বলে 'হাসান' বলেছেন *(মির'আত ৩/১০১)*। ইমাম শাওকানী হাদীছটিকে جديرا بالتصحيح বা 'ছহীহ হওয়ার যোগ্য' বলেছেন। দারাকুৎনী বলেন, অত্র হাদীছের সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত' *(নায়লুল আওত্বার (কায়রো ছাপা ১৯৭৮) ৩/৯৫, মির'আত ৩/১০১)*।

এক্ষণে যদি আমরা হাদীছটিকে 'ছহীহ' ধরে নিই, তাহ'লে এখানে বর্ণিত সাকতা দু'টির পরিমাণ কতটুকু হবে, সে সম্পর্কে ছাহেবে মির'আত বলেন, সূরা ফাতিহা শেষে সাকতার পরিমাণ হবে ليتراد إليه نفسه وليعلم المأمومون أن لفظة آمين ليست من القرآن 'যাতে তার পরবর্তী নিঃশ্বাস ফিরে আসে এবং যেন মুক্তাদীগণ উক্ত বিরতির কারণে বুঝতে পারে যে, 'আমীন' শব্দটি কুরআনের অংশ নয়'। অর্থাৎ একটা শ্বাস নেওয়ার সময় মাত্র এবং এটা কেবলমাত্র ইমামের স্বস্তির জন্য, মুক্তাদীর ক্বিরাআতের জন্য নয়। অতঃপর তৃতীয় সাকতা অর্থাৎ রুকুর পূর্বের সাকতার পরিমাণ সম্পর্কে ইমাম শাওকানী বলেন, وهي أخف من السكتتين اللتين قبلهما وذلك بمقدار ما تنفصل القراءة عن التكبير... 'এটি প্রথম দু'টি সাকতার পরিমাণের চেয়ে কম হবে। এটি হবে রুকুর তাকবীর থেকে ক্বিরাআতকে পৃথক বুঝাতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু মাত্র। কেননা ক্বিরাআতের সাথে রুকুর তাকবীরকে মিশিয়ে ফেলতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন' *(নায়ল ৩/৯৬ পৃঃ; মির'আত ৩/১০০; 'আওনুল মা'বূদ হা/৭৬৩-এর ব্যাখ্যা ২/৪৮২ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সাকতাগুলি ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। যা তরক করলে ছালাত বিনষ্ট হয় না বা সিজদায়ে সহো লাগে না। ইমাম শাওকানী বলেন, উক্ত তিনটি সাকতাকে 'মুস্তাহাব' গণ্য করেছেন ইমাম আওযাঈ, শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাক্ব প্রমুখ। তবে আহলুর রায় (হানাফীগণ) ও ইমাম মালেক প্রথমটি ব্যতীত বাকীগুলিকে 'মকরূহ' বলেছেন। অবশ্য শাফেঈগণ চতুর্থ আরেকটি সাকতার কথা বলেছেন। সেটি হ'ল ওয়ালায যাল্লীন ও আমীন-এর মধ্যবর্তী সময়ে। যাতে 'আমীন' শব্দটিকে সূরা ফাতিহা থেকে পৃথক করা যায়' *(নায়ল ৩/৯৬)*।

এক্ষণে সাকতার সময়ে মুক্তাদীগণ সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন কি-না, সে বিষয়ে ইমাম নববী ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে সাকতার সময় শাফেঈগণের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, يسكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة 'ইমাম সাকতা করবেন এতটুকু সময় যতটুকুতে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা পাঠ করতে পারে' *(নায়ল ৩/৯৬)*। ইবনু হাযম স্বীয় মুহাল্লার মধ্যে বলেন, মুক্তাদীগণ প্রথম সাকতায় সূরা

ফাতিহা পাঠ করবে। না পারলে দ্বিতীয় সাকতায় পাঠ করবে' *(মির'আত ৩/১০০)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, والثانية قد قيل إنها لأجل قراءة المأموم، فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط। 'দ্বিতীয় সাকতা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, এটি মুক্তাদীর ক্বিরাআত পাঠের সময় দানের জন্য। এ কথার ভিত্তিতে সূরা ফাতিহা শেষ করা পর্যন্ত বিরতি দীর্ঘ করা উচিত। অতঃপর তৃতীয় সাকতাটি (রুকুর পূর্বে) কেবলমাত্র ইমামের স্বস্তি লাভ ও শ্বাস গ্রহণের জন্য' *(যাদুল মা'আদ ১/২০১)*। শাফেঈগণের, কিছু কিছু হাম্বলীদের, ইবনু হযম ও ইবনুল ক্বাইয়িমের উপরোক্ত বক্তব্য তাদের 'ইজতিহাদ' মাত্র। কেননা প্রথম সাকতায় 'ছানা' পড়া সম্পর্কে ছহীহ হাদীছে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় সাকতায় সূরা ফাতিহা পড়তে বলার কোন দলীল নেই।

অতএব আমরা মনে করি, এ বিষয়ে ছহীহ হাদীছের ফায়ছালাই চূড়ান্ত। যেমন (১) ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন ফজরের ছালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, সম্ভবতঃ তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কিছু পাঠ করে থাক? আমরা বললাম, হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لاَتَفْعَلُوْا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لاَصَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا 'তোমরা এরূপ করো না কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা ব্যতীত। কেননা এটি পাঠ না করলে ছালাত সিদ্ধ হয় না' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৮৫৪ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*। (২) জেহরী ছালাতে মুক্তাদী কখন কিভাবে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, এরূপ এক প্রশ্নের জবাবে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, اِقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ 'তুমি এটা মনে মনে পড়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩ 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১২)*। রাবী ও ছাহাবীর এধরনের স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়ার পরে অন্য কারু বক্তব্য তালাশ করা মুমিনের কর্তব্য নয়।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ বলেন, والجمهور لايستحبون أن يسكت الامام ليقرأ المأموم 'জমহূর বিদ্বানগণ এটা মুস্তাহাব মনে করেন না যে, ইমাম চুপ থাকুন, যাতে মুক্তাদী ক্বিরাআত পড়তে পারে' *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'আ ফাতাওয়া (কায়রো ছাপা ১৪০৪হিঃ) ২২/৩৩৯)*। সঊদী আরবের সাবেক গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায অনুরূপ এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ليس هناك دليل صريح صحيح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في

الصلاة الجهرية

'জেহরী ছালাতে মুক্তাদীর সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করার জন্য ইমাম সাকতা করবেন, এই মর্মে কোন স্পষ্ট ও ছহীহ হাদীছ নেই'। ইমামের বিরতি কালীন অথবা ক্বিরাআত কালীন সর্বাবস্থায় মুক্তাদী নীরবে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে হাদীছের সাধারণ নির্দেশের কারণে যে, 'সূরা ফাতিহা ব্যতীত ছালাত সিদ্ধ নয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)*। অন্যতম প্রধান মুফতী শায়খ ছালেহ আল-উছায়মীনও অনুরূপ বলেন *(আব্দুল্লাহ ইবনু বায, মজমূ'আ ফাতাওয়া নং ৩৯০, ৪/৩৭৮ পৃঃ; উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম নং ২৪৫, পৃঃ ৩২৩)*।

শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী বলেন, لا دليل فيه على مشروعية سكوت الامام بعد الفاتحة قدر ما يقرأها المؤتم كما يقولها بعض المتأخرين

'উপরোক্ত কথার মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠের পরে ইমামের চুপ থাকার এবং সেই সময় মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠের কোন দলীল নেই। যেমন পরবর্তীকালের কেউ কেউ বলে থাকেন' *(আলবানী, মিশকাত হা/৮১৮-এর টীকা-৪)*। ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠের পরে হউক বা রুকূর পূর্বে হৌক, সব সময় একই হুকুম। কারণ দু'টিরই রাবী হাসান বছরী।

ছাহেবে তুহফাতুল আহওয়াযী বলেন, 'মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করা ইমামের সাকতা করার সাথে শর্তযুক্ত নয়। বায়হাক্বী মাকহূল থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমাম সাকতা করুন বা না করুন, ইমামের আগে হৌক, সাথে হৌক বা পরে হৌক মুক্তাদীকে নীরবে সূরা ফাতিহা পড়তেই হবে' *(তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী (কায়রোঃ ছাপা ১৯৮৭) হা/৩১১-এর ব্যাখ্যা ২/২৩৭)*।

উপরের আলোচনার সার-সংক্ষেপ এই যে, কেবলমাত্র তাকবীরে তাহরীমার পরের সাকতাটিই ছহীহ হাদীছ সম্মত। যেখানে কেবল চুপে চুপে 'দো'আয়ে ইস্তেফতাহ' পড়তে হয়। সূরা ফাতিহা শেষে ও রুকূর পূর্বের সাকতা দু'টি সম্পর্কে হাদীছ ছহীহ হওয়ার বিষয়টি বিতর্কিত। যদিও ওয়াক্ফের কারণে আপনা থেকেই সেখানে সাকতা বা বিরতি হয়ে যায়। কিন্তু উক্ত দু'স্থানের কোথাও মুক্তাদীকে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, এ মর্মে ছহীহ, যঈফ কোন হাদীছ নেই। ছাহাবীগণের কোন বক্তব্য বা আমলও নেই। সেকারণ ছহীহ হাদীছের ফায়ছালা অনুযায়ী জেহরী ছালাতে মুক্তাদী কেবল নীরবে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, যা ইমামের সাকতার সঙ্গে শর্তযুক্ত নয়।

এক্ষণে রুকূর পূর্বে সাকতা করে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পড়ার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে প্রশ্নে যেগুলি বলা হয়েছে, সেগুলি বাড়াবাড়ি বৈ কিছুই নয়।